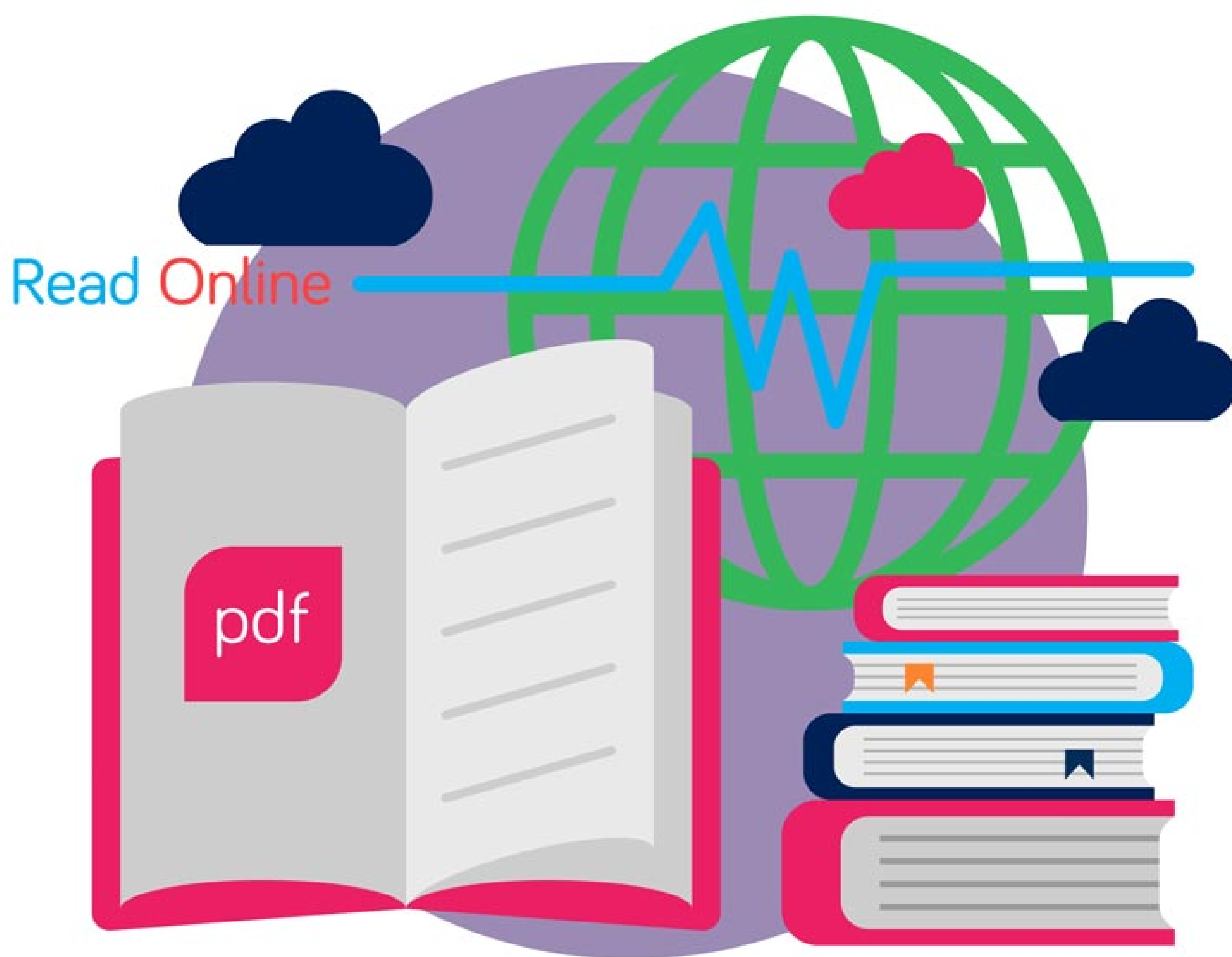


E-BOOK



পড়শি যদি আমায় ছুঁতো

আনিসুল হক



কী কব সেই পড়শির কথা
ও তার হস্ত-পদ-স্কন্ধ-মাথা নাই রে।
ও সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর
আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে॥

পড়শি যদি আমায় ছুঁতো
আমার যম-যাতনা যেতো দূরে।
আবার, সে আর লালন একখানে রয়,
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে॥

—লালন শাহ



একটা লাশ পড়ে আছে। ধানমণ্ডি ৮ নম্বরের সেতুর নিচে। স্বাস্থ্যসন্ধানী হাঁটিয়েদের পায়ে চলার ইটবাঁধানো পথের পাশেই। লাশ পড়ে আছে, এই বিবৃতিটা কি যথেষ্ট? নাকি বলতে হবে, একটা মানুষের লাশ? একটা মানুষ পড়ে আছে বললে কী হয়! নাকি মানুষ মরে গেলে আর মানুষ থাকে না? লাশ হয়ে গেলে মানুষ আর মানুষ থাকে না! মানব তো নয়ই। ঝোপের আড়ালে এক জোড়া জুতা দেখে নাসির আলী এগিয়ে গিয়েছিল। জুতার সঙ্গে একজোড়া প্যান্টের পা, তার ওপরে রক্তাক্ত জামা, তার ওপরে মানুষের মুখ। মৃত যে সন্দেহ নাই। এই সাতসকালে, কাকডাকা ভোরে, এই পবিত্র সুবহে সাদিকে একটা মানুষের বেগতিক পরিণতি দেখতে হলো! না, ভয় নয়, সহানুভূতি নয়, নিজের সারাটা দিন আজ কেমন যাবে, এই রকম একটা নীচ স্বার্থচিন্তাই প্রথম দেখা দিল নাসিরের মনে। সে তাড়াতাড়ি দূরে সরে গেল এবং জোরে হাঁটতে লাগল। একটু পরে, অভ্যাসের বাইরেই, সে দৌড়াতে শুরু করল। তার মধ্যে সামান্য ভয়, খানিকটা বিমর্ষভাব সঞ্চারিত হলো এরপর।

বহুমূত্র রোগ ধরা পড়ার পর থেকে নাসির আলী নিয়মিত প্রাতঃভ্রমণে বের হচ্ছে। আজ একটু সকাল-সকালই বেরিয়েছিল সে। অন্ধকার তখনও ভালো করে কাটেনি। সিঁড়ি বেয়ে দোতলা থেকে নেমে নিচতলার সিঁড়ির গোড়ায় দেখতে পেল ঘন অন্ধকার। অন্ধকার না কাটতেই ঘর থেকে বেরুনো কি ঠিক হবে, একবার ভাবল সে। কিন্তু গেট পেরিয়ে বাইরে আসতেই দেখা গেল চাল ধোয়া পানির মতো, নাকি চাল ধুচ্ছে যে সাদা হাত দুটো, তার মতো, আকাশ থেকে আলো নামছে, ধরিত্রীর অন্ধকার তাড়িয়ে দেবে বলে।

নাসির আলী হাঁটতে হাঁটতে ধানমণ্ডি লেকের পারে বাঁধানো হাঁটা পথে চলে এলো। ধানমণ্ডি লেকের পাড়টা সত্যি সুন্দর। ইটবাঁধানো পথ। এক পাশে লেক। লেকের ধারে নানা ধরনের গাছ। শরৎকালে এই পথে শিউলি ফুল পড়ে থাকে। আজও শিউলিতলায় ঝরা ফুলগুলোকে বাঁচাতে রাস্তার এক দিকে সরে যেতে হয়েছিল তাকে। তখন মনে হয় সে গান গেয়ে ওঠে, পথিকপরাণ চল, চল সে পথে তুই, যে পথ দিয়ে গেছে রে তোর বিকেলবেলার জুঁই। জুঁইফুল অবশ্য ফুটে থাকতে দেখেনি সে এই পথের ধারে কখনও, কিন্তু লেকের পশ্চিম দিকে তিন নম্বর রাস্তার ধারে বকুলফুল ফুটে থাকতে সে দেখেছে। এই বকুলফুল-ফোটা পথটি তাকে তার শৈশবে নিয়ে যায় প্রত্যেকবার। তার মনে হয়, খুব কুয়াশাঢাকা ভোরে সে আর তার ছোটবোন বাড়ির সামনের স্কুলের মাঠে যেত বকুলফুল কুড়াতে। ফুল কুড়িয়ে এনে মার হাতে দিলে মা মালা গেঁথে দিতেন। মা মালা গাঁথতে পারতেন, কিন্তু সুঁইয়ে সুতা পরাতে পারতেন না। সেই কাজটা নাসিরকেই করে দিতে হতো।

কিন্তু আজকের সকালটা তার আর সব দিনের মতো হলো না। একটা মানুষকে এইভাবে পড়ে থাকতে দেখে মনটা বিস্বাদে তেতো হয়ে উঠল। কানের কাছে একটা সোঁ সোঁ শব্দ বাজতে লাগল বিরক্তিকরভাবে।

ভেবেছিল লেকের দক্ষিণ পাশটা পুরোটা চক্কর দেবে, অর্ধেকটা গিয়ে সে রণে ভঙ্গ দিল। কিন্তু দূর থেকে ৮ নম্বর সেতুর কাছে সেই লাশের জায়গাটার দিকে সে আরেকবার তাকিয়ে দেখল, একজন-দুজন কৌতূহলী মানুষ সেখানে জমতে শুরু করেছে। সে তাড়াতাড়ি চোখ ফেরাল। ৫ নম্বর সড়কের মাথায় ভাপাপিঠা বিক্রেতা মহিলাটি তার উনুনে অগ্নিসংযোগ করছে। দুইজন খুব মোটা লোক পাশাপাশি হলো তার একটু দূরে, তাদের একজনকে পেভমেন্ট ছেড়ে নেমে যেতে হলো মাটিতে। নাসির আলী মুচকি হাসল। তারপর তার নিজের মনেই জেগে উঠল একটা চাপা চোখরাঙানি-বোধ, এই হাসলা কেন? একটা মানুষ ওইখানে মরে পড়ে আছে, আর তুমি হাসলা, নাসির আলী!

ওই দিন নয়, তারপরের দিনে খবরের কাগজে খবরটা বেরুল। ধানমণ্ডি লেকের ধারে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির লাশ উদ্ধার। পরে, খবরটা নিয়ে সে অনেকবার ভেবেছে। খবরের কাগজে অজ্ঞাতনামা কথাটা কেন এত গুরুত্ব পেল? নামটা কি খুব দরকারি কিছু? একটা মানুষ পড়ে আছে, প্রাণহীন,

সেই মানুষটা কিছু নয়, গুরুত্বপূর্ণ তার নামটা। নাকি দেহটা নাম নয়, প্রাণটাই হলো নাম? আমি কে? এই যে আমার নাম নাসির আলী, তাহলে নাসির আলীটা কে? আমি, আমার শরীর, নাকি আমার প্রাণ। নাকি আমার নামটা নাসির আলী, কিন্তু শরীরটা নাসির আলী নয়। তাহলে শরীরটা কে? শরীরটা কী?

'নাসির ভাই, ও নাসির ভাই!'

'জি!'

'পড়েছেন এই আর্টিকেলটা?'

'কোনটা?'

'কাগজে থার্ড পেজে যে-আর্টিকেলটা বেরিয়েছে।'

'কোনটা যেন?'

'আরে শোনেন না! ভেরি ইন্টারেস্টিং...'*এই ঢাকা শহরে প্রায় এক কোটি মানুষ। এর মধ্যে অন্তত ৯০ লাখ লোক রোজ ঘর থেকে কোনো না কোনো প্রয়োজনে বেরিয়ে পড়ে, কর্মস্থলে, স্কুল-কলেজে, রাস্তায়, হাটে-মাঠে যায়— মজার ব্যাপার হল এদের প্রায় সবাই তাদের ঘরে ঠিক ঠিক ফিরে আসে, যদি না কোনো অ্যাকসিডেন্ট ঘটে। নিজের ঠিকানা চিনতে কারো কোনো ভুল হয় না।*' মজার না?'

'হুম ইনটারেস্টিং।'

সচিবালয়ের ভেতরে, ১০ তলায়, গবেষণা কর্মকর্তার কর্মহীন চেয়ারটায় বসে পাশের সিটে বসা আরেক কর্মকর্তা মামুনের এই উক্তি তথা উদ্ধৃতি পাঠটাও নাসির আলীকে পেয়ে বসে।

মামুন, গলায় মাফলার, একটু পর পর কাশি দিচ্ছে, বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে লক্ষ-কোটি ভাইরাস, ফ্যাসফেসে গলায় বলে, 'না, মোটেও ইন্টারেস্টিং না। কেবল ঢাকা শহরে নয়, সারা দুনিয়ার ৬ কোটি মানুষই ঘর থেকে বেরিয়ে নানা জায়গায় যায় কাজে কিংবা অকাজে, নিজ নিজ ঘরে এক সময় ফিরে আসে, না ফিরলে আমরা বলি নিখোঁজ। মানুষের এটা না পারার কিছু নেই। মজার ব্যাপার হল, শুধু মানুষ নয়, সব পাখিও ঘরে ফেরে, যার যার ঘরে, শেয়াল তার গর্তে, কাঠবিড়ালি তার কোটরে, পিঁপড়া ঢোকে গর্তে। শীতের পাখিরা হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে এদেশে আসে আবার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে শীতের দেশে ফিরে চলে যায়। কী আশ্চর্য এই ডিসিপ্লিন, কী ক্রুয়েল!'

বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গবেষকের চেয়ারে বসা মামুনের এই চিন্তার সংক্রাম নাসির আলী নিজের ভেতরে টের পেতে থাকে। সত্যি তো, কী করে রোজ ঠিক বাসাটাতে আমরা হাজির হই! প্রত্যেকেই কি হয়? এমনও তো হয়, পরিবারের অন্য সদস্যরা অপেক্ষা করছে, কিন্তু একজন ফেরে না। ওই যে, ধানমণ্ডি লেকের ধারে নাম-পরিচয় হারিয়ে শুয়ে থাকা প্রাণহীন লোকটা, সে তো ফেরেনি।

কম্পিউটারের সামনে বসে থেকে কিছুক্ষণ সলিটেয়ার খেলে, পত্রিকার বাসাভাড়ার বিজ্ঞাপন নিচ থেকে ওপরের দিকে পড়ে পড়ে সময় নিত্যদিনের মতো কেটে গেলে অফিস থেকে বেরুনোর একটা ভদ্রোচিত বিকাল এসে পড়ে। নাসির আলী চেয়ার থেকে কোট তুলে নিয়ে গায়ে চাপায়, মামুনকে জিজ্ঞেস করে, 'কী মামুন, যাবেন না?'

'হাতের কাজটা সেরে যাই। দেরি হবে। আপনি যান নাসির ভাই।'

মামুন কী একটা কাজ করতে চায়। করুক। সারাদিন সময়ক্ষেপণই তার কাজ। আর কী কাজ আছে তাদের করবার!



নাসির বেরয় অফিস-কক্ষ থেকে। লিফট বেয়ে নামে। শত শত লোক অফিসের গেট দিয়ে বের হচ্ছে। রাস্তায় নামছে। সরকারি অফিসের বাসগুলো রাস্তায় নড়াচড়া করছে মোটা মোটা পেট নিয়ে।

অফিসের বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরের সিঁড়িতে নাসির একটুখানি থামে, কে যেন তাকে ডাকছে, এই যে...

একজন আগন্তুক তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে তার সঙ্গে কথা বলে, 'কেমন আছেন?'

নাসির লোকটাকে চিনতে পারে না, সময় নেবার জন্যে কথা চালিয়ে যাওয়ার মতলবে বলে, 'ভালো।'

'ভাবি কেমন আছে?'

এই প্রশ্নের জবাব নাসির আলীর ভালো করে জানা নাই বটে, তবুও সে বলে, 'ভালো।'

আগন্তুকও যেন অনুমোদন ও উৎসাহ পেয়ে যায়, সে এবার প্রশ্ন করে, 'ইসবগুলের ভুষিটা ভালো ছিল?'

'জি!' নাসির আলী ঠিক বুঝতে পারে না কোন ইসবগুলের ভুষির কথা হচ্ছে।

কিন্তু ভদ্রলোক কথা চালিয়েই যাচ্ছেন— 'ইসবগুলের ভুষিটা! বুঝলেন, ওই গন্ধওয়ালাটা ভালো না। আর্টিফিসিয়াল সেন্ট, আর্টিফিসিয়াল কালার স্বাস্থ্যের জন্যে খুবই খারাপ। কাজেই একেবারে অরিজিনাল ভুষিটাই খাবেন।'

'জি!' নাসির আলী আমতা আমতা করে।

'আপনি আমাকে চিনতে পারেননি?'

'না ঠিক... চিনতে পারছি না'—এইবার নাসির আলী স্বীকার করবার সৎসাহস দেখায়।

'আমি ফারুক। বিসিআরএস-এ কাজ করি। আপনি হামিদ ভাই তো?'

'না তো..'

'আপনি হামিদ ভাই না?' ফারুক নামের লোকটা বিস্মিত!

নাসির আলী তার ভুল ধরিয়ে দেয়—'জি না। আমার মনে হয় আপনি ভুল করছেন?'

লোকটা বলে, 'হামিদ ভাই, ইয়ারকি করছেন না তো!' তার চোখেমুখে অবিশ্বাস।

নাসির আলী মৃদু হেসে বলে, 'আপনার সাথে কি আপনার হামিদ ভাইয়ের ইয়ারকির সম্পর্ক?'

'এই হামিদ ভাই'—যেন ঠিক ধরে ফেলেছে, এই রকম আত্মবিশ্বাস নিয়ে ফারুক নামের ভদ্রলোক বলে।

নাসির আলীও দৃঢ়তার সঙ্গে বলে, 'আমি হামিদ ভাই না।'

'স্যরি আমি ভেবেছিলাম আপনি হামিদ ভাই..' লোকটা, ডান গালে খয়েরি জরুল, লজ্জিত ভঙ্গি করে দ্রুত জনারণ্যে মিশে যায়।

নাসির এগোয়। সিঁড়ি বেয়ে মানুষের ভিড়ে রাস্তায় নেমে পড়ে সে। অফিসপাড়ায় ছুটির সময় বাজার বসে। ঠাণ্ডা পড়ছে বলে রাস্তায় নানা শীতবস্ত্র বিক্রি করছে ফেরিওয়ালারা, ফুটপাথেই পসার সাজিয়ে বসেছে কেউ কেউ।

নাসির ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখে, চারদিকে অগণন মানুষ, চারদিকে কোলাহল, বাড়িফেরতা মানুষগুলো বাসের জন্যে দৌড়াচ্ছে, মানুষ হাঁটছে। এই সবগুলো মানুষ যার যার ঘরে ফিরে যাবে!

মামুন তখন একটা খবর পড়ছিল:

'এই *ঢাকা শহরে প্রায় এক কোটি মানুষ। এর মধ্যে অন্তত ৯০ লাখ লোক রোজ ঘর থেকে কোনো না কোনো প্রয়োজনে বেরিয়ে পড়ে, কর্মস্থলে, স্কুল-কলেজে, রাস্তায়, হাটে-মাঠে যায়, মজার ব্যাপার হল এদের প্রায় সবাই তাদের ঘরে ঠিক ঠিক ফিরে আসে, যদি না কোনো একসিডেন্ট ঘটে। নিজের ঠিকানা চিনতে কারো কোনো ভুল হয় না।*'

এইভাবে নাসির চিন্তা করেনি। নিজের ঠিকানাও কি কেউ কখনও ভুলে যেতে পারে। হয়তো পারে। মানুষ তো একটা কম্পিউটারই। তার মেমোরি থেকে যে কোনো ফাইল মুছে যেতে পারেই। ভুল বাটনে একটা চাপ পড়লেই হলো।

নাসির একটা দেওয়ালের গায়ে লাগানো পত্রিকার পাশে দাঁড়ায়। শীতের বিকালে ভিড়ের মানুষের শরীরের ওমটা তার খারাপ লাগে না। পত্রিকায় একটা খবরে তার চোখ পড়ে। *অজ্ঞাতনামা যুবকের লাশ উদ্ধার।* সে সামনের লোকটার মাথার ফাঁক গলে খবরটা আবার পড়ে। ধানমণ্ডির সেই লাশটার খবর। এই পত্রিকাতেও অজ্ঞাতনামা কথাটায় খুব জোর দেওয়া হয়েছে। অজ্ঞাতনামা। নাম জানা যায়নি যার। নামটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট, না? নাম জানা না থাকলে ... খুব মুশকিল...

সামনের মাথাওয়ালা তার দিকে ঘুরে তাকায়, হামিদ ভাই, কী ব্যাপার, কোনো গরম খবর নাকি? এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পেপার পড়ছেন যে?

নাসির লোকটার মুখের দিকে তাকায়। এর মুখে জরুল নাই। এই লোকটার কপালে সেজদা দেবার কড়া। সে বলে চলে, 'হামিদ ভাই, উত্তরার প্লটের জন্যে দরখাস্ত করেছিলেন নাকি? কালপরশু অ্যালটমেন্টের লিস্ট বেরিয়ে যাবে।'

নাসির ধন্ধে পড়ে যায়, কথা চালিয়ে যাবার জন্যেই বলে, 'না করি নাই..'

'করেন নাই কেন? গ্রেট অপরচুনিটি মিস করলেন'—কপালে-কড়া আফসোস করে।

'তাই তো দাঁড়াচ্ছে। আপনি করেছিলেন?'

'না করি নাই। আমার তো ভাই নগদ টাকা নাই যে ইনস্টলমেন্ট শোধ করব। অ্যাপ্লিকেশন ফরমের সাথে যে টাকা দিতে হয়, সেইটাই আমি দিতে পারতাম না।'

'ও।' নাসির আলী যেন একটা জটিল ধাঁধার উত্তর জানতে পারল।

'সেই টাকাটা জোগাড় করতে পারলেই আমি দরখাস্ত করতাম। প্লট পেলে আজকাল অ্যালটমেন্টের কাগজও বিক্রি করা যায়।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। পত্রিকায় দেখবেন, শুক্রবারে বিজ্ঞাপন থাকে। প্লটের অ্যালটমেন্ট বিক্রয়!'

'তাই নাকি?' নাসিরের কণ্ঠে সত্যিকারের বিস্ময়।

'হ্যাঁ। আচ্ছা আসি.., ভাবিকে নিয়ে বেড়াতে আসবেন।'

কপালে-কড়া ভিড়ের মধ্যে অসংখ্য কপালের ভিড়ে মিশে যায়। হায় কপাল, এই লোকটাও তাকে হামিদ বলল কেন! হামিদ ভাইটা কে? তার

নামটা কি হামিদ ভাই হয়ে গেল? স্লামালেকুম, ঢাকা স্টেডিয়াম থেকে আব্দুল হামিদ বলছি। মৃধা, এই যে দর্শনীয় কিকটা মুন্না এক্ষুনি নিল, এ সম্পর্কে তোমার মন্তব্য কী... ধন্যবাদ হামিদ ভাই...

নামটা ইম্পর্ট্যান্ট।

কিন্তু এইভাবে খবরের কাগজ পড়াটা তার উচিত হচ্ছে না। দেয়ালে আঠা দিয়ে সাঁটা খবরের কাগজ বিনাপয়সায় পড়ে ফেলাটা! সে তো আর সচিবালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নয়, সে রীতিমতো সায়েন্টিফিক অফিসার। সে পত্রিকা পড়বে কিনে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিখরচায় কাগজ পড়া তাকে মানায় না।

সে হকারের কাছ থেকে একটা পত্রিকা কেনে। দাম বুঝিয়ে দেয়। তারপর অজ্ঞাতনামা যুবকের লাশ উদ্ধারের খবরটা হকারের সামনে দাঁড়িয়েই আবার পড়তে থাকে। ধানমণ্ডি লেকের ধারে পড়ে-থাকা লোকটার পায়ের জুতা জোড়া কোন কোম্পানির ছিল? তার মনে প্রশ্ন জাগে। রং কী ছিল তার প্যান্টটার! রক্তাক্ত শার্টটা! না, তার কিছু মনে পড়ছে না। তখন হঠাৎ করেই তার মনে প্রশ্ন জাগে, তার নিজের নামটা আসলে কী? নাসির না হামিদ! আচ্ছা, আমার নাম হামিদ না তো... দুর তা কী করে হয়... আমার নাম কী? নাসির। নাসির আলী... নাসির আলী তো আমার নাম... নাকি আমিই হামিদ আলী... হামিদ ভাইয়ের নামটা নাসির ভাই করে দিয়ে আমার নামটা হামিদ আলী করে দিলে কী হবে...

আমার নাম নাসির আলীই তো?

এখন আমাকে আমার বাড়িতে ফিরতে হবে।

নাসির আলী উত্তরার এসি বাসগুলোর লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ে।

একজন আগন্তুক, তার গায়ে চামড়ার জ্যাকেট, এসে তাকে জিগ্যেস করে, 'বাই, ও বাই..!'

নাসির তাকায়। এও কি তাকে এখন হামিদ ভাই বলে ডাকবে! না, লোকটা তাকে জিজ্ঞেস করে, 'এটা কিসের লাইন? বাসের না?'

নাসির আলী বিপন্ন বোধ করে। সে ঠিক জানে না, এটা কিসের লাইন। সে এখানে দাঁড়িয়েছে বটে। তবে সেটা অভ্যাসবশত। রোজই তো পিংক লাইন নামের একটা বাসে ওঠে। সেটা তাকে সায়েন্স ল্যাবরেটরির মোড়ে নামিয়ে দেয়। বাকিটা পথ সে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফেরে। সে অনিশ্চিতভাবে উত্তর দেয়: 'মনে হয়।'

চামড়ার জ্যাকেট বলে, 'বাস কই যাইত?'

নাসির এ প্রশ্নে অস্বস্তি বোধ করে। সে তার পেছনের জনের দিকে তাকায়। হাত ইশারায় দেখায়, 'একে জিগ্যেস করেন। আমি ঠিক জানি না।'

আগন্তুক পেছনের লোকের কাছে যায়, 'বাস কই যাইব?'

পেছনের লোক জবাব দেয়, 'উত্তরা যাবে, উত্তরা। আপনি কই যাবেন?'

'দক্ষিণখান।'

'উত্তরা উত্তরে, দক্ষিণখান নিশ্চয় দক্ষিণে। তাহলে আপনি রাস্তার ওই পাড়ে গিয়ে উল্টোদিকের বাস ধরেন।'

পেছনের লোকের পরামর্শে চামড়ার জ্যাকেট রাস্তা পার হয়।

আচ্ছা আমি কেন উত্তরার বাসের লাইনে? আমার বাসা তো...

সে পত্রিকাটা খোলে। হ্যাঁ, লাশটা পড়ে ছিল ধানমণ্ডিতে। তার মানে সে ধানমণ্ডিতে থাকে। তার বাসের লাইন তো ওই পাশের পিংক ছাতার সামনেরটা। এই ভুলটা সে কী করে করল? কোনোদিন তো তার ভুল হয় না! সে তো রোজই অফিস থেকে বেরিয়ে ঠিক ঠিক নিজের বাসায় চলে যায়। আচ্ছা, আমি নাসিরই তো! নাকি আমি হামিদ! হামিদের বাড়ি কি উত্তরা! হতে পারে। না হলে ওই কপালে-কড়া লোকটা তাকে উত্তরার প্লটের কথা বলছিল কেন?

আমি হামিদ, না নাসির, এই সওয়ালের জবাব কী?

নাসিরের পকেটে আইডি কার্ড আছে। দেখে নিলেই তো হয়, সে আসলে কে? সে পকেটে থেকে আইডি কার্ড বের করে। আইডি কার্ডে নাম ও ছবি দেখা যায়। নামটা নাসির আলী। তাহলে এই পরিচয়পত্রের বাহক হচ্ছেন নাসির আলী। এখন চেহারাটা মিলিয়ে দেখা দরকার। তার চেহারা আর আইডি কার্ডের ছবির চেহারা মেলে কি না! সে সামনে পার্ক করে রাখা একটা গাড়ির কাচে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে। আইডি কার্ডের ছবিটার দিকে তাকিয়ে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকায়। এইবার সে নিশ্চিত যে তার নাম নাসির আলী। সে কোনো অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি নয়। তার মনে এক ধরনের ভরসার বোধ জন্ম নেয়।

একটা বাস আসে। নাসির দৌড়ে যায় বাসের কাছে। লাইনের পেছনে দাঁড়ায়। কিন্তু বাসে প্রথম দফায় উঠতে সে ব্যর্থ হয়। লাইন না ছাড়লে সে অবশ্য উঠতে পারত।

বাস চলে যায়।

সে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন তার মনে হয়, সে ভুল বাসের লাইনে দাঁড়িয়েছে। তার নাম নাসির আলী, বাসা ধানমণ্ডি। সে উত্তরার বাসে উঠতে যাবে কেন? সে বাসের লাইন পাল্টায়। এবার সে পিংক লাইনের ছাতার পেছনে লাইনে গিয়ে দাঁড়ায়।

বাস আসে। সে বাসে উঠে পড়ে। গোলাপি রঙের বাস। একটা সিটে সে বসে।

বাস চলে। বাসের জানালা দিয়ে শীতের হাওয়া আসে, তার সঙ্গে পেট্রল পোড়া গন্ধ, আর নানা ধূলিকণা। সে একটা হাত নিজের নাকের সামনে রাখে।

তখন তার মনে আবার একটা সাধারণ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জেগে ওঠে। তার নামটা যদি বদলে হামিদ আলী হয়ে যায়, তাহলে কি তার ব্যক্তিত্ব বদলে যাবে? লোকটা তো সে সেই আগের নাসির আলীই থাকবে। আচ্ছা, তার চেহারাও যদি বদলে যায়, আর নামটা, কিন্তু স্মৃতি যদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে কী হবে? অথবা যদি চেহারাটা এক থাকে, আর মস্তিষ্কের হার্ডডিস্কের মেমোরি যদি পাল্টে যায়, তাহলে কি সে আরেকটা মানুষে পরিণত হবে?

তার এই সব অদ্ভুতুড়ে চিন্তা বাধাগ্রস্ত হয় পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোকের প্রশ্নে—'যাচ্ছেন কোথায়?'

নাসির তাকায়।

'যাচ্ছেন কোথায়? উত্তরায় তো?' ভদ্রলোক বলেন।

না তো। সে কেন উত্তরা যাবে? সে তো যাবে ধানমণ্ডি।

'এই গাড়ি উত্তরা যাবে নাকি?' নাসির আলী উদ্বিগ্ন স্বরে বলে।

'না, গাড়ি যাবে মোহাম্মদপুর শিয়া মসজিদ হয়ে রিংরোড পর্যন্ত!'

'তাহলে আমি উত্তরা যাব কেন?'

'না, যাবেন না। আমার প্রশ্নের উত্তর হলো যাব না। এইটা ব্রিটিশ কথা। ওরা খুবই ভদ্র জাতি। ওরা কোনোদিনও বলবে না, আপনি কোথায় যাচ্ছেন। বলবে, অধিক দূরে যাইবেন কি? তখন আপনি যদি বলতে চান আপনি কোথায় যাচ্ছেন, আপনি বলবেন। এই জন্যে বললাম। উত্তরার কথা বললাম যাতে আপনি বলেন আপনি কোথায় যাচ্ছেন।'

'আমি সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে নেমে যাব।'

'তাহলে তো বেশি দূরে না।'

'জি না।'

'ভাইজানের বাড়িটা কি ধানমণ্ডিতেই?'

'হ্যাঁ।'

'নিজের?'

'জি?'

'নিজের বাড়ি? নাকি ভাড়া?'

'ভাড়া।'

'শান্তিতে আছেন ভাই। ভাড়া বাড়িতেই শান্তি। নিজের বাড়ি থাকলে আজ এটা নষ্ট হয়ে গেছে, কাল পানি ওঠে না... কত ঝামেলা। তা আপনার ভাবি আবার এসব বোঝে না।'

'জি... কে বোঝে না বলছেন?' নাসির আলী দু চোখ কুচকে বলে।

'আপনার ভাবি। তার একটা নিজের বাড়ি চাই-ই চাই।'

নাসির আলী আশ্বস্ত হয়। এই ভাবি তাহলে তার ভাবি নয়। এই ভাবি এই সহযাত্রীর নিজের স্ত্রীই হবেন সম্ভবত। নাসির গল্পের তালে তাল দেয়, 'তাহলে একটা বাড়ি তাকে করে দিলেই তো পারেন।'

লোকটা হাত শূন্যে দুলিয়ে বলে, 'আপনি তো ভাই বলেই খালাস। একটা বাড়ি করার কত ঝামেলা আপনি জানেন?'

নাসির আলীর সরল স্বীকারোক্তি, 'জি না, জানি না।'

'আমি জানি। ইটের দাম এখন খাসির মাংসের চেয়েও বেশি। বালির দাম বেশি গুঁড়া মশলার চেয়েও। আর সিমেন্টের দাম? তার চেয়ে..'

নাসির আলী তুলনাগুলো পছন্দ করে। সিমেন্টের দাম কিসের চেয়ে বেশি এটা জানা দরকার। সে জিজ্ঞেস করে, 'সিমেন্টের দাম কিসের চেয়ে বেশি বললেন?'

'না বলিনি। মিল খুঁজছি। সিমেন্টের দাম বেশি ধরেন চিনির চেয়েও বেশি'—সহযাত্রী অবশেষে একটা মিল খুঁজে পায়।

নাসির আলীর বিস্ময় জাগে। এই ভদ্রলোক সবকিছুকে রান্নাবান্নার সঙ্গে তুলনা করছেন কেন। সঙ্গতভাবেই সে প্রশ্ন করে, 'আপনি কি রান্নাও ভালো করেন নাকি?'

'কেন বলেন তো!'

'এই যে আপনি সবকিছু রান্নার জিনিসের সাথে তুলনা করলেন।'

'ও। মানে দামটা কী রকম বেশি তাই বোঝালাম। তার ওপর আছে মিস্ত্রিদের সাথে খিটিমিটি। কন্ট্রাক্টর ডিলিংস। আর আপনি চোখ একটু এদিক ওদিক করেছেন তো মরেছেন। একেবারে আপনাকে ফুটো করে দেবে। বিশ্বাসী লোকের খুব অভাব।'

বিশ্বাসী লোক তো চারদিকে অনেক। ভদ্রলোক কি বিশ্বস্ত লোকের কথা বোঝাতে চাইছেন? কে জানে? নাসির আলী ভাবে।

'আচ্ছা। আমি আসি। আমাকে নামতে হবে।' নাসির আলী জানালা দিয়ে বাইরে এলিফ্যান্ট রোডের জুতোর দোকান দেখে ওঠার তাগিদ বোধ করে।

সায়েন্স ল্যাবরেটরির মোড়ে এসে বাস দাঁড়ালে নাসির আলী নেমে যায়। সূর্য এখনও ডোবেনি। তবু লাইটপোস্টগুলোয় সোডিয়াম বাতি জ্বলে উঠবার চেষ্টা করছে। এবং আশ্চর্য যে, বাতিগুলো হলুদ নয়, কমলা।

সে আকাশের দিকে তাকায়। আকাশও কমলা।

ফুটপাথে একজন ফেরিওয়ালা অনেকগুলো কমলা ডালায় সাজিয়ে রেখেছে, সম্ভবত বিক্রির জন্যে।

'নাসির ভাই, অফিস থেকে ফিরলেন?'

নাসির পাশ ফিরে তাকিয়ে বলে, 'হ্যাঁ। আপনি?'

'যাব একটু নিউমার্কেট। কালার আর পেপার কিনতে...ওদিকের অবস্থা কী? আজকে না আবার শুনলাম বিক্ষোভ মিছিল আছে। গোলযোগ কিছু দেখলেন?'

'কই, না তো?' নাসির আলী মাথা নাড়ে।

'গাড়িটাড়ি ভাঙছে না তো?'

'তেমন তো কিছু দেখি না।'

'ঠিক আছে তাইলে..'

একটা ধূসর হলদেটে ছায়া ক্রমে হারিয়ে যায়। মিলিয়ে যায় দৃশ্যের গভীরে।

একটা মোড়ে চার রাস্তা চারদিকে গেছে। নাসির চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়।

সে কোনদিকে যাবে? সে এতদিন ধরে নিজের ঘরে ফিরছে, এতটা কাল, ভেবে-চিন্তে তো ফিরতে হয়নি। অভ্যাসমতো ফিরেছে। কোনোদিন তো মনে হয়নি, নিজের বাড়ি চিনতে পারব না। আজ সে

সচেতনভাবে নিজের বাড়ি যাচ্ছে। কিন্তু তার মনে হচ্ছে সে নিজের বাড়ি চিনতে পারবে না। সে আসলে কত নম্বর রাস্তায় কত নম্বর বাড়িতে থাকে, জানে না। হায় হায়, তার কাছে তো নিজের বাড়ির ঠিকানা লেখা কোনো কাগজ নাই। তাহলে সে কোনদিকে যাবে? প্রথমে সে একদিকে যায়। তার মনে প্রশ্ন জাগে, এই দিকেই তো। সে আবার ফিরে আসে। আরেক দিকে যায়। আবার ফিরে আসে। সে তখন সিদ্ধান্ত নেয়, ভেবে-চিন্তে সে বাড়ি পৌঁছাতে পারবে না। আপন গতিতে চলতে হবে। সে আবার বাস স্টপেজে যায়। এবং নিজের গন্তব্যের কথা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে। সেটা করার জন্যে সে তার বাবার মৃত্যুর দিনটার কথা ভাবতে শুরু করে। সেইদিন ছিল বৃষ্টি আর বৃষ্টি। তাদের হলের সামনে পানি জমে বাইরে বেরুনোর উপায়ও বন্ধ হওয়ার উপক্রম। সেই সময় হলের গেটের টেলিফোনে কল এল। দারোয়ান বলল, 'স্যার আপনার ফোন...আপনার চাচা।'

নাসির ফোন ধরলে চাচা বলেন, 'বাবা একটা খারাপ খবর আছে। তোর বাবা মারা গেছে।'

নাসির আলী বলে, 'আচ্ছা।'

চাচা বলেন, 'আমি যাচ্ছি তোদের বাড়িতে। তুই আমার সাথে চল।'

সে বলে, 'না, কালকে আমার একটা পরীক্ষা আছে।'

চাচা বলেন, 'বাবা, তুই বুঝতে পারছিস না আর্জেন্সিটা।'

বাবা মারা গেছে। বাবা মারা যাওয়ার দিনটায় সে তেমন ভেঙে পড়েনি। তেমন করে কাঁদেওনি। কিন্তু মায়ের মৃত্যুটা তাকে খুব ধাক্কা দিয়েছিল। স্কুল থেকে তাকে ডেকে আনা হল। বাবার অফিসের পিয়ন অফিসে গিয়ে বলল, 'নাসির বাড়ি চলো, তোমার মা..'

'কী হয়েছে?' ছোট্ট নাসির হাফপ্যান্টের পকেটের মধ্য থেকে কালোজাম বের করতে করতে বলে।

'চলো।'

'মার কী হয়েছে?' নাসির চোখ সরু করে তীক্ষ্ণ স্বরে বলে।

পিয়ন আলিমুদ্দি আংকেল মুখ থেকে একদলা থুতু ফেলে বলল, 'আরে ছেলে খালি প্রশ্ন করে। মা তোমার বিষ খাইছে।'

তখন নীল হয়ে গেল পুরোটা পৃথিবী। আকাশ নীল, গাছপালা নীল, মা নীল। আর তার ছোটবোন নাজনিন, সেও নীল। নাজনিন, নাজু, তুই কেন

নীল হয়েছিলি বোন? নাসিরের পকেট ভরা কালোজামের কষ লেগে কি নীল হয়ে গিয়েছিল সবকিছু।

হ্যাঁ। অন্য চিন্তায় কাজ হচ্ছে। সে তার বাড়ির সামনে এসে হাজির হয়েছে। ঠিক তো? এইটা তার নিজের বাড়ি তো!

নাসির তার বাসার সামনে যায়। কলিং বেল টেপে। তার স্ত্রী দরজা খুলল।

স্ত্রী শুধায়, 'কাকে চাই?'

'এটা বাড়ি নম্বর ৪, রোড নম্বর ৫ না?' নাসির বলে।

'হ্যাঁ, নম্বর ঠিক আছে।' রেবা কপালে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ফোটায়।

'নাসির আলীর বাসা না এটা?'

রেবা বলে, 'হ্যাঁ।'

নাসির জিজ্ঞেস করে, 'আপনি?'

'আমি ওনার মিসেস! কিন্তু আপনি কাকে চান?'

'আমিই নাসির আলী।'

'আপনিই নাসির আলী। শিয়োর?'

'কনফিডেন্ট। লক করে দিতে পারেন।'

'বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলে আপনি চলে যেতে পারেন।'

'না না, আমিই নাসির। কিন্তু তুমি রেবা তো?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি যদি রেবা হও, তা হলে তো আমাকে তোমার চিনতে পারার কথা। তুমি কি শিয়োর তুমি রেবা?'

'হ্যাঁ।'

'আমি যে নাসির এ ব্যাপারে আমার কাছে প্রমাণ আছে। এই যে আইডি কার্ড। কিন্তু তুমি যে রেবাই, প্রমাণ কী?

'দেখি আইডি কার্ড..?'

নাসির পকেটে হাত দেয়। মানি ব্যাগ বের করে। এর মধ্যে আইডি কার্ডটা ছিল। এখন সেটা সে আর খুঁজে পাচ্ছে না।

সে বিড়বিড় করে, 'ওয়ালেটেই তো ছিল। গেল কই?'

'খোঁজেন, খুঁজতে থাকেন। কোনোদিনও পাবেন না। কারণ আপনি নাসির না।'

'আপনি কি শিয়োর?' নাসির আলী হতাশ কণ্ঠে বলে।

'কী ব্যাপারে?'

'যে আমি নাসির নই?'

'নিশ্চয়।'

'কী করে এত নিশ্চিত হচ্ছেন?'

'কারণ আপনার আইডি কার্ড নাই। যান যান...কেটে পড়েন!' রেবার কণ্ঠে ভর্ৎসনা।

নাসির একটু দূরে সরে যায়। স্ত্রী দরজার আড়ালে অন্তর্হিতা হন। দরজা বন্ধ হয়ে যায়। এমন সময় আরেকটা লোক আসে। গুণ্ডাদের মতো চেহারা। গায়ে বোঁটকা গন্ধ। লোকটা এক হাতে চিরুনি বের করে মাথার চুলে বোলাতে বোলাতে আরেক হাতে কলিংবেল টেপে। নাসির দূরে দাঁড়িয়ে দেখে। রেবা দরজা খোলে।

'কে?'

'আমি নাসির।'

দূরে দাঁড়িয়ে নাসির বিড়বিড় করে, আশ্চর্য তো, লোকটা নিজেকে নাসির বলছে। ওই গুণ্ডালোকটা নাসির!

'নাসির?' রেবা আবার জিজ্ঞেস করে।

লোকটাও তো নাছোড় খুব, বলছে, 'হ্যাঁ, আমি নাসির।'

রেবাও মনে হচ্ছে কনফিউজড—সে বলে, 'আপনি শিয়োর যে আপনি নাসির।'

গুণ্ডামার্কা জোর দিয়ে বলে, 'হ্যাঁ।'

'কী করে শিয়োর হলেন?'

'এই যে আমার কাছে আইডি কার্ড আছে।' বলে লোকটা সত্যি সত্যি আইডি কার্ড বের করে রেবাকে দেখায়।

রেবাও দেখা যাচ্ছে সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দেয়। রেবা এ কী করছে! সে কি বুঝছে না যে ওই গুণ্ডামার্কা লোকটা নাসির নয়। নাসির বিড়বিড় করে, লোকটা নিশ্চয়ই আমার আইডি চুরি করেছে বা কুড়িয়ে পেয়েছে। কিন্তু রেবা নাসিরের কথা শুনতে পায় না।

আচ্ছা আসো ভেতরে আসো আজ অফিস থেকে এত দেরি করে এলে যে...বলে রেবা লোকটাকে বাড়ির ভেতরে টেনে নেয়।

নাসির চিৎকার করে ওঠে, 'ওটা আমার আইডি কার্ড, ওটা আমার আইডি কার্ড...পড়ে গিয়েছিল...'



না। ভাবনাটা ভয়ঙ্কর। এ রকম হতে পারে নাকি? তার স্ত্রী রেবা তাকে চিনতে পারবে না, এটা ঘটা কি সম্ভব! নাসির পুরোপুরি বিভ্রান্ত বোধ করে। সত্যি যদি এমন হয় যে তার স্ত্রী তাকে চিনতে পারে না? কিংবা যদি এমন হয় সেই নিজের বাড়ি চিনে নিতে ভুল করে? সে যদি আর কারো দরজায় গিয়ে হাজির হয়!

সে খানিকক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করে।

তারপর সাহস সঞ্চয় করে বাড়ির সামনে যায়। বাড়ির সামনে নেমপ্লেট। তার নাম লেখা। সেটা দেখে সে নিশ্চিত হয় যে এটা তারই বাড়ি। নিচতলায় অন্য ভাড়াটে। ওপরতলায় তাদের বাস। সে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেটে দাঁড়িয়ে দোরঘন্টির বোতাম চাপে।

দরজা খোলে গৃহপরিচারিকা। সে কোনো কথা বলে না। নাসির ঘরে ঢোকে। তার স্ত্রী রেবা বসে বসে উলের কাঁটা বুনছে। তাকে দেখে সে কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে না। ভাবলেশহীন মুখে শুধু একটা বাক্যই উচ্চারিত হয়, 'জয়তুন, চায়ের পানি চুলায় দে।'

নাসির ঘরে যায়। সে কাপড়চোপড় ছাড়ার আয়োজন করে। অফিসের কাপড়চোপড় ছেড়ে ঘরের কাপড় পরে বাথরুমে যায়। বাথরুমে জয়তুন গরম পানি দিয়ে গেলে পানির ভাপে আয়না ছেয়ে যায়। সে আয়নায় লেখে *নাসির*। আয়নায় ভাপ সরিয়ে নিজের মুখ দেখার ব্যবস্থা করে। নিজের চেহারাটা সে এতদিন ধরে দেখছে। কিন্তু আজ সে নিশ্চিত নয় আয়নায় যাকে দেখা যায়, সে আসলে সে-ই কি না। আয়নায় কি অন্য কারো প্রতিবিম্ব পড়া সম্ভব? আগামীকাল সকালে ঘুম থেকে উঠে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আয়নায় যদি অন্য একটা মুখ সে দেখে ফেলে, তাহলে কী হবে?

রেবা আসে— 'শোনো, বাসায় নাশতা কিছু নাই। পরাটা ভেজে দিতে বলব, খাবা?'

'আবার কষ্ট করার দরকার কী?'

'খালি পেটে শুধু চা খাবা? তোমার না এসিডিটি?'

'তাও তো কথা..।'

'মুড়ি মেখে দিব পিঁয়াজ-মরিচ দিয়ে..?'

'একটু আদাও দিও।'

রেবা কাজে চলে গেলে নাসির আশ্বস্ত বোধ করে–সব ঠিক আছে। নাসির আমার নাম, রেবা আমার বউ, এটা আমার বাড়ি।

মুড়ি-চানাচুর মাখা এসে গেছে। সঙ্গে চা। নাসির খুব একমনে মুড়ি খেয়ে চলেছে।

রেবা বলে, 'মুড়ি মাখানোটা কেমন হয়েছে?'

নাসির উত্তর না দিয়ে খেয়েই চলে।

'এই, কী বলি, মুড়ি মাখানোটা কেমন হয়েছে?'

'খুব মজা। খুব..!' নাসির আপন মনে মুড়ি চিবোয়।

রেবা খানিকটা মুড়ি নিজের মুখে দিয়ে মুখটা বিকৃত করে বলে, 'এই তুমি মানুষ নাকি? মুড়ি তো রীতিমতো ভিজা চিড়া হয়ে গেছে? খাচ্ছ কী করে?'

নাসির তবু একমনে খায়। স্ত্রী সামনে থেকে মুড়ির বাটি সরিয়ে ফেলে।

'তোমার কী হয়েছে? পোতানো মুড়ি খাচ্ছ কী করে?' রেবা জিজ্ঞেস করে।

'ও, পোতানো নাকি? পোতানো.. শোনো, আমাদের জেলায় মুড়ি নরম হয়ে গেলে কী বলে জানো, সেম্‌টে যাওয়া। বলে মুড়ি সেম্‌টে গেছে।' নাসির নিষ্পাপ বালকের মতো হাসে।

'কথা ঘুরাচ্ছ কেন?'

নাসির আবার মুড়ি খায়। খুব মন দিয়েই খায়।

রেবা খুবই বিরক্তিভরে উঠে যায় তার সামনে থেকে।

ফোন আসে। বিরক্তিকর শব্দে রিং বাজে। রেবা ধরে।

নাসির আড়চোখে তাকায় রেবার দিকে। রেবার শরীর বেশ সম্পন্ন হয়েছে। ৮ বছর আগে যখন তাদের বিয়ে হয়, রেবা ছিল ছিপছিপে এক তরুণী। এখন, ব্লাউজের নিচে, কোমরে, কটিদেশে একটা উঁচু ভাঁজও দেখা

যাচ্ছে রেবার শরীরে। ৩০ বছরের রেবা এখন অনেকটা ভাদ্রের নদীর মতো। তার তুলনায় নাসির বেশ খানিকটা বুড়িয়ে গেছে বলতে হবে। ৩৬ পেরিয়েছে সবে, এখনই চুল পেকে গেছে অনেক। অকালপক্ক চুল নিয়ে সে অবশ্য চিন্তিত নয়। টাক না পড়লেই হলো। সাদা চুল রং মাখলেই কালো হবে। চাই কি লাল নীল খয়েরিও বানানো যাবে। কিন্তু টাক পড়ে গেলে তখন আর উপায় থাকবে না।

ফোনে রেবা বলে, 'হ্যালো, চৈতী, কী করছিলি?'

ও পাশ থেকে চৈতী বলে, 'শোন, রিডার্স ডাইজেস্টে একটা আর্টিকেল পড়লাম। বাবা হওয়ার টিপস দিয়েছে। তুই এক কাজ কর, নাসির ভাইকে..।'

'দাঁড়া এক মিনিট। জয়তুন, টুল এগিয়ে দাও তো।'

জয়তুন টুল এগিয়ে দিলে রেবা বসে। নাসির স্ত্রীর ভাব বোঝে। রেবা আসলে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলবে। নাসির আস্তে করে উঠে বারান্দায় যায়।



শীতসন্ধ্যায় আকাশ থেকে অন্ধকার আর কুয়াশা নামছে মশারির মতো করে। শীতের সন্ধ্যার একটা মন খারাপ করা ব্যাপার থাকে। সূর্য এখনও ডোবেনি, তবে পশ্চিমাকাশ মেঘকুয়াশার আড়ালে চলে গেছে। অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়েছিল বলেই এখনও এই সন্ধ্যাটাকে সে পাচ্ছে বারান্দায়। নইলে বাসের জানালা দিয়েই তাকে সন্ধ্যা দেখতে হতো।

বারান্দায় কাপড় শুকাতে দেবার তার। তাতে কয়েকটা ভেজা কাপড় ঝুলছে। তারই ফাঁক গলে সে রেলিং ধরে দাঁড়ায়। ভেজা কাপড়ের শৈত্য তার শরীর ছোঁয়। কাপড় ভেজা কেন। রেবা কি বিকালে গোসল করেছে! ও বিকালে গোসল করবে কেন। রোদ থাকতে থাকতে করবে। আর তাহলে এই সন্ধ্যাবেলায় কাপড় ভেজা থাকবার কোনো কারণ নাই।

বারান্দায় অনেক কাক এসে ভিড় করেছে। এর কারণ নাসির রোজ বিকালে কাকদের রুটি দেয়। আজ দেওয়া হয় নাই।

'দেখছেন দেখছেন, কাকেও মানুষ চিনে! আপনে আইছেন আর কাক আইসা ভইরা গেছে। ডেলি আপনে যে রুটি দেন। খাড়ান, রুটি আইনা দেই।' জয়তুন কখন বারান্দায় এসে গেছে, নাসির টেরই পায়নি।

রুটি আনতে ভেতরে যায় মেয়েটি।

সত্যি কি কাকও মানুষ চেনে? কী জানি। নাসির নিজেকেই চিনছে না। সে তো রেবাকেও চেনে না। এই যে চৈতী ফোন করে রেবাকে, নাসির তা-ই জানত, কিন্তু একদিন রেবা কথা বলছিল চৈতীর সঙ্গে, কর্ডলেসটা সে, নাসির, তুলেছিল একটা কল করবে বলে, কানে দিয়ে শোনে রেবা কথা বলছে একজন পুরুষ মানুষের সঙ্গে। পুরুষ মানুষ কথাটা ভেবেও নাসির মনে মনে হাসে। শুধু পুরুষ বললে কি হতো না! আবার মানুষ বলতে হলো!

হয়তো হতো না। যেমন শুধু লাশ বললে হয় না। মানুষের লাশ বলতে হয়! তেমনি শুধু পুরুষ বললে হয় না। পুরুষ মানুষ বলতে হয়! হায়রে পুরুষ!

জয়তুন রুটি নিয়ে এসে নাসিরের হাতে দেয়। মেয়েটা, ছোটখাটো, এই শীতেও সে খালি-পা, হাফপ্যান্ট, গায়ে শুধু একটা সোয়েটার! ওর শীত লাগে না!

মানুষের লাশটারও পরনে সোয়েটার জ্যাকেট কিছু ছিল না। তারও কি শীত লাগে না!

নাসির রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে দেয় কাকদের। জয়তুন চলে গেলে সে কাকদের সঙ্গে গল্প শুরু করে।

নাসির বলে, 'ধরেন আমার নাম আব্দুল হামিদ। নাম বদলে গেছে, তাহলেও কি আপনারা আমার কাছে আসবেন?'

কাকগণ জবাব দেয়, 'কা কা কা...'

'আমাকে চিনতে পারবেন?'

'কা কা কা...'

'নাকি পারবেন না?'

'কা কা কা কা..'

'বলে কী? পারবে..!'

জয়তুন আসে। নাসিরের কার্যকলাপ দেখে বিস্মিত হয়। খালুকে কি জিনে ধরেছে? খালু একা একা কথা বলে কার সঙ্গে?



মাথার ভেতর থেকে ভাবনাগুলো তাড়াতে পারছে না নাসির। আসলে তার নাম কী, নাম বদলালে মানুষ বদলে যায় নাকি, একজনের মাথার সবগুলো কোষ আরেকজনের মাথায় ঢুকিয়ে দিলে কোনটা হবে আসল মানুষটা, রেবা এখন কার সঙ্গে কথা বলছে। আহা বেচারি রেবা! নিঃসন্তান। বিশ্রামের ভারে ধ্বস্ত। খানিকটা নিঃসঙ্গতা ঘোঁচানোর জন্যে সে যদি কারো সঙ্গে কথা বলে, নাসিরের কী বলার আছে?

নাসির ওঠে। বাসায়-পরা পাজামা-কাম ট্রাউজারটা ঠিক রেখে গায়ে একটা জ্যাকেট চাপিয়ে সে বাইরে বেরয়। দরজার লকের বোতামটা টিপে বাইরে থেকে দরজার কবাট টেনে বন্ধ করে দেয়।

বাসার বাইরে এসে ফুটপাতে ওঠে। রাস্তার ওইপাশে একটা চিতই পিঠা বানানেওয়ালা। তার কেরোসিন দীপের শিখাটা মৃদু বাতাসে দুলছে আর লকলক করছে।

কেরোসিন দীপ দেখলেই নাসিরের শৈশবের কথা মনে হয়। ছোটবেলায় তার বাবার পোস্টিং হয়েছিল একটা থানাসদরে, যেখানে বিদ্যুৎ ছিল না। কেরোসিনের খোলাবাতিও তারা ব্যবহার করত। সেটাকে তারা বলত ল্যাম্পো। প্রত্যেক বিকালে হ্যারিকেন বাতিগুলোর চিমনি পরিষ্কার করা হতো। তারপর সলতে পরানো, কেরোসিন ভরানো–এইসব ছিল মায়ের নিত্যদিনের কাজ। কেরোসিনের গন্ধের সঙ্গে যেন লেপ্টে আছে মায়ের শরীরের গন্ধও।

পিঠা বানাচ্ছে একটা শুকনো মতো লোক, ল্যাম্পোর আলোয় তার মুখ কাঁপছে। ধানমণ্ডি লেকের ধারে পিঠা বানায় একজন মহিলা। এইখানে একটা মহিলা থাকলে কী হতো? নাসির কি তার গায়ে মায়ের গন্ধ পেত!

নাসির হাঁটতে হাঁটতে যায় পাড়ার ভিডিও দোকানে। লম্বাচুল মুখে

ব্রনের দাগ এক যুবক বসে আছে দোকানে। নাসির বলে, 'আপনাদের কাছে সিডি আছে?'

দোকানি কী একটা ভিডিও ছবি দেখছে ছোটো টিভিপর্দায়। হিন্দি ছবি। সেদিক থেকে চোখ না তুলে সে বলেঃ 'আছে।'

'এরিন ব্রোকোভিচ আছে? জুলিয়া রবার্টসের?' নাসির জিজ্ঞেস করে।

'দেখতে হবে,' মুখে ব্রনের দাগ কার্ডগুলো দেখে, তারপর বলে, 'না, বাইরে গেছে।'

নাসির বলে, 'মকবুল ফিদা হুসেনের কী একটা সিনেমা এসেছে না?'

'গজগামিনী?'

'ওটা দেন।'

'সিডি নিতে গেলে মেম্বার হতে হবে।'

'মানে?'

'২০০ টাকা জমা রাখতে হবে।'

'আচ্ছা দিলাম জমা,' বলে সে টাকা খুঁজতে থাকে।

দোকানি খাতা বের করে বলে, 'নাম বলেন।'

'জি?'

'আপনার নাম?'

'হামিদ.. আব্দুল হামিদ...না হামিদ আলী।'

'৪ নম্বর বাড়ি না?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার নাম তো নাসির, নাসির আলী!'

'আপনি কী করে জানেন আমার নাম কী?'

'নাম বদলান ক্যান, সিডি তো চাইলেন এক নম্বর?'

'মানে?'

'যারা দুই নম্বর নাইলে ধরেন তিন নম্বর ক্যাসেট নেয় সিডি নেয়, তারা নাম বদলায়াই মেম্বার হয়।'

'মানে?'

'দুই নম্বর তিন নম্বর বোঝেন না?' দোকানি তাচ্ছিল্যের সুরে বলে।

'শোনেন হামিদ আলী আমার নাম... অনেকের দুটা নাম থাকে না? আমারও দুটা..নাসির আলী হামিদ আলী.. ।'

'আরো ২০ টাকা দেন।' দোকানি কথা সংক্ষিপ্ত করে কাজের কথা পারে।

টাকা দিয়ে সিডি নিয়ে নাসির বেরয়।

দোকানি বিড়বিড় করে বলে, 'শালা কী রকম তিন নম্বর বলেন, এমন ভাব করে দুই নম্বর বুঝে না!'

সিডি নিয়ে নাসির আলী ফিরে আসে। রেবা বাথরুমে। নাসির আলীর মাথায় কী জানি দুষ্টবুদ্ধি খেলা করে। সে ফোনের কাছে যায়। কলার আইডি ফোন। কোন নাম্বার থেকে ফোন এসেছিল, সেটা আছে মেমোরিতে। সে নাম্বারটা বের করে ডায়াল করে।

ও পাশ থেকে চৈতীর গলাই শোনা যায়, 'হ্যালো রেবা, আবার ফোন করলি কেন? জরুরি কিছু?'

নাসির আলী বলে, 'জরুরি কিছু নাকি। আমি আমার এক বন্ধুর কাছে ফোন করব বলে রিসিভড কল থেকে এই নাম্বারটা বার করলাম, এটা তোমার কাছে গেল নাকি চৈতী! স্যরি।'

'নাসির ভাই, গেছে তো কী হয়েছে, আপনাকে তো আমি খুঁজছি। শোনেন, একটা উপায় পাওয়া গেছে। একজন নতুন ডাক্তার এসেছেন, আপনি তাকে একবার দেখান, আমার অফিসের একজন তো এই ডাক্তারকে দেখিয়ে বাচ্চার বাবা হয়ে গেল।'

ডাক্তার! তা দেখানো যায়। ডাক্তারি কবরেজি কম করেনি রেবা আর নাসির। তবু ওদের বাচ্চা হচ্ছে না। কলকাতা আর ব্যাংকক গিয়ে ডাক্তার দেখিয়েছে তারা।

লাভ হয়নি বলে পীরের মাজারে যায় রেবা। একবার নাসিরকেও সঙ্গে করে সে নিয়ে গিয়েছিল। মাথায় ঘোমটা দিয়ে দোয়া-দরুদ পড়েছিল রেবা। মাজারের খাদেম একপাশে বসে আছে চোখ বন্ধ করে। লালসালু দিয়ে ঢাকা উঁচু টাইলস-বাঁধানো সমাধি। আগরবাতি জ্বলছে। ধোঁয়ায় আর গন্ধে পরিবেশটা অস্বাস্থ্যকর, নাকি অলৌকিক, নির্ণয় করা মুশকিল। লম্বা দাড়ি, সাদা আলখাল্লার লোকটার কাছে গিয়ে রেবা বলেছিল, 'হুজুর আমার জন্যে দোয়া করবেন।'

হুজুর বলেছিল, 'হবে মা, সন্তান হবে। আল্লার ওপরে ভরসা রাখো। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সব আল্লার হাতে।'

'আপনি দোয়া করবেন হুজুর।' রেবার গলা ধরে এসেছিল। রেবা চিকন সুরে কাঁদতে আরম্ভ করেছিল।

'নিয়ৎ ঠিক রাখতে হবে। নিয়ৎটাই আসল।'

হুজুর চোখ বন্ধ করে দোয়া করেছিলেন।

নাসির আর কখনও যায়নি ওই মাজারে। রেবা হয়তো এখনও যায়, মাঝে-মধ্যে। রেবা আর কোথায় কোথায় যে যায়।

সারাদিন একা একা থাকে মেয়েটা। কী করবে সে? বাচ্চাকাচ্চা হলে সমস্যাটার একটা স্বাভাবিক সমাধান পাওয়া যেত। প্রকৃতি তাকে এই সমাধান থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

কিন্তু নাসিরের মাথা থেকে পোকাটা যায় না। তার নাম হামিদ আলী, নাকি নাসির আলী? আর এক সন্ধ্যায়, রেবা যখন টেলিভিশন দেখছে, নাসির আলী রেবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, টেলিভিশনের আলো বাড়ে-কমে, রেবার মুখও একবার উজ্জ্বল একবার অনুজ্জ্বল দেখায়, সেই আলোয় নাসিরের মনে হয়, এই মেয়েটি কি সত্যি রেবা? খুব ভালো করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার একসময় মনে হয়, এই মেয়েকে সে চেনে না। এই মেয়ে রেবা নয়। তাহলে এ কে? তাকে কি সে বলবে, আপনি কে? আমাদের শোবার ঘরে বসে আছেন কেন? বলবে, নাকি বললে মেয়েটি তাকে পাগল ভাববে!

রেবাকে কিছু না জানিয়ে একজন মনোচিকিৎসকের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করে নাসির। বিকালবেলা, অফিস থেকে বেরিয়ে, তাদের ধানমণ্ডির কাছেই মীরপুর রোডের ওপরে ডাক্তারের চেম্বারে সে যায় দ্বিধা-সংকোচ বুকে নিয়ে। লোকে তাকে পাগল বলবে না তো! ডাক্তারের চেম্বারের বাইরে বিশাল সাইনবোর্ড। এত বড় করে কোনো ডাক্তারের নাম লেখা থাকতে পারে, নাসির ভাবতেই পারে না। এত বড় কেন সাইনবোর্ডটা! তখন তার মনে হয়, এই চিকিৎসকের রোগীরা যেহেতু মনোরোগী, তাদেরকে হয়তো এই রকম বড় নিয়ন সাইন দিয়েই আকৃষ্ট করতে হয়।

ডাক্তারের চেম্বারের সামনে ওয়েটিং রুমে বসে থেকে একুশে টিভিতে পথের প্যাঁচালি নামের একটা অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে নাসির লক্ষ করে, অপেক্ষমাণ রোগীদের বেশির ভাগই মহিলা। বস্তুত সে ছাড়া এই ঘরে আর কোনো পুরুষ নাই। সে কি ভুল করে স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞের কাছে এসে গেল নাকি! সে ওঠে, বাইরের রিসিপশনিস্টের কাছ থেকে চেয়ে নেয় ডাক্তারের বিজনেস কার্ড, তাতে স্পষ্ট করে লেখা মনোচিকিৎসক।

হামিদ আলী, রিসেপশনিস্ট তার নাম ধরে ডাকে। নাসির আলী ভেতরে ঢোকে।

ডাক্তার সাহেব মধ্যবয়সী, মাথায় টাক, পরেছেন কমলা রঙের শার্ট, এর আগে কোনো পুরুষ(মানুষ)কে নাসির কমলা রঙের শার্ট পরতে দেখেছে কি না মনে করতে পারে না।

ডাক্তার তার মুখের দিকে না তাকিয়ে প্রেসক্রিপশন লেখার প্যাডের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আপনার নাম?'

'হামিদ আলী।'

'বয়স?'

'ছত্রিশ।'

'বলেন, আপনার অসুবিধা কী?' এইবার ডাক্তার সাহেব মুখ তুলে নাসির আলীর দিকে তাকান।

'আমি ঠিক বলতে পারছি না এটা কোনো অসুবিধা কি না.. আমি আমার নাম নিয়ে খুব কনফিউজড।'

'মানে?'

'যে আমার নাম কী? নাসির নাকি হামিদ। আপনাকে কী বললাম, আমার নাম হামিদ। কিন্তু আমার নাম আসলে নাসির।'

'নাসির তো হামিদ বললেন কেন?'

'বললাম না, এইটাই আমার সমস্যা?' নাসির নির্বিকার মুখে বলে।

'তা আপনি হামিদ না বলে নাসির বলেন।'

'আচ্ছা আমার নাম নাসির। নাসির আলী।'

'হুঁ।' ডাক্তার গম্ভীর। তিনি প্রেসক্রিপশনে হামিদ আলীর নিচে নাসির আলী নামটাও লেখেন।

'আমার পকেটে আইডি কার্ড আছে, তাতে আমার নাম লেখা, আপনাকে দেখাতে পারি, দেখাব?' নাসির আলী উৎসাহের সঙ্গেই বলে।

'দেখান।' ডাক্তার চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বলেন।

নাসির তার আইডি কার্ড বের করে ডাক্তারকে দেখায়। ডাক্তার তার পদ-পদবী সবই জেনে যান। বলেন, 'আপনাদের এটা কি বিসিএস দেওয়া চাকরি?'

'জি।'

'আচ্ছা বলেন, আর কী সমস্যা হয়?'

'আবার মনে হয় বাড়িটা কি আমার বাড়ি? পথ ভুল করছি না তো? চেক না করে ঢোকাটা কি ঠিক? আমার পরিচিত নিকটজনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়, উনি কি আমার আসলেই পরিচিত, নাকি অন্য কেউ? আবার তার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মনে হয় ইনি কে? ইনি তো তিনি নন।'

'আচ্ছা, আপনি একটু এই বেডটাতে আসুন। আমি একটু ব্লাড প্রেসারটা চেক করি।'

ডাক্তারের নির্দেশমতো নাসির আলী যথাস্থানে শুয়ে পড়লে ডাক্তার তার ব্লাড প্রেসার মাপেন, স্টেথোস্কোপ দিয়ে বুক পরীক্ষা করেন, শ্বাস নিতে ও ছাড়তে বলেন, চোখ দেখেন, জিহ্বা দেখেন। তারপর বলেন, 'আচ্ছা বসেন।'

নাসির আবার গিয়ে চেয়ারে বসে। ডাক্তার তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কোনো অসুবিধায় আছেন? অফিসে? ব্যবসায়? কনজুগাল লাইফে? বলুন, সব খুলে বলুন।'

নাসির মাথা নাড়ে, 'না, কোনো অসুবিধা নাই।'

ডাক্তার মিষ্টি করে হাসেন। 'আমাকে লুকাবেন না। বলুন..!'

'বলার মতো কোনো কিছু নাই..।' নাসির আলী ততোধিক মিষ্ট হাসি উপহার দেয়।

'আপনি নেশা করেন?'

'না।'

'আগে করতেন?'

'না।'

'সিগারেট, গুল, তামাকপাতা, ফেন্সিডিল, গাঁজা, হেরোইন, ট্যাবলেট, কোনো কিছুরই নেশা নাই আপনার?'

'না।'

'ডায়াবেটিস আছে?'

'জি, র‍্যানডম ১২ পর্যন্ত উঠেছিল। এখন কন্ট্রোলে রেখেছি। রোজ হাঁটি।'

'আচ্ছা। আপনার বাসায় কে কে আছেন?'

'আমার স্ত্রী আছেন। কাজের মেয়ে।'

'আর কেউ নেই?'

'নাই। একটা বোন আছে। মেলবোর্নে থাকে।'

'আপনার ছেলেপুলে?'

'না নাই।'

নাই কেন? নেন নাই নাকি..?'

'না, হয় না।'

'ডাক্তার দেখিয়েছেন?'

'জি।'

'সমস্যাটা কার?'

'আমার। স্পার্মে সেমেনের কোয়ানটিটি কম।'

'আচ্ছা। এই নিয়ে সংসারে অশান্তি আছে?'

'জি না।'

'আমার মনে হয় আমাদেরকে আরো কয়েকটা সেশন দিতে হবে। আপনাকে মন খুলে সব বলতে হবে। শোনেন, বলাটাও চিকিৎসার অংশ। আপনি যদি মন খুলে বলেন, আপনার ভারটা অনেক কমে যাবে। আপাতত আমি কিছু ওষুধ দিচ্ছি। আপনার ডিপ্রেশন কমানোর জন্যে। আপনি ঠিকমতো ওষুধ খাবেন। আর এক্সারসাইজ করবেন। রোজ হাঁটবেন।'

'রোজই তো হাঁটি। হাঁটতে গিয়েই সমস্যার শুরু। একটা লাশ দেখেছিলাম লেকের ধারে..।'

'লাশ দেখার পরেই সমস্যাটার শুরু?' ডাক্তার সাহেব যেন একটা সূত্র পেয়ে যান যা থেকে রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হতে পারে।

'ঠিক বলতে পারব না। তবে লাশটা দেখার পর মনে হয় সমস্যাটা বেড়েছে।'

'এটাকে বলা হয় ইনসিকিউরিটি কমপ্লেক্স।'

'আচ্ছা।' একটা নতুন তথ্য জানার মতো একটা অনুভূতি হয় নাসিরের মনে।

'রাতে ঘুম ভালো হয়?' ডাক্তার সাহেব সদ্যপ্রাপ্ত সূত্র ধরে এগুনোর চেষ্টা করেন।

'জি। ভালো হয়।'

'কফি খান?'

'নিয়মিত না। মাঝে-মধ্যে পেলে খাই।'

'খাবেন না।'

'আপনার কি কখনও মনে হয় শ্বাস নেবার জন্যে যথেষ্ট বাতাস নেই?'

'না।'

'ভয়ে হাত-পা অবশ হয়ে যায়?'

'না।'

'হঠাৎ শীত অনুভব করেন?'

'জি না।'

'হাতে-পায়ে আঙুলের মাথায় চিনচিনে পিন ফোটানোর ব্যথা হয়?'

'জি না।'

'প্যানিক ডিজঅর্ডার না।' ডাক্তার অনুচ্চ কণ্ঠে বলে।

'জি?'

'না ঠিক আছে। আপনার ভয়ের কিছু নেই। সব ঠিক আছে। আপনি ৭ দিন পরে আবার একবার আসুন।' ব্যবস্থাপত্রের এককোণে একিউট স্ট্রেস ডিজঅর্ডার লিখতে লিখতে ডাক্তার বলেন। রোগীর লক্ষণগুলো ঠিক কোনো একটা নির্দিষ্ট ছকে ফেলা যাচ্ছে না– ডাক্তার সাহেব মনে মনে ভাবেন, একে আরো পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

টাকা নগদ পরিশোধ করে প্রেসক্রিপশন নিয়ে নাসির আলী বেরিয়ে আসে।



দেরি করে বাড়ি ফিরে নাসির দেখে বাসায় রেবা নাই। জয়তুন বাড়িতে একা। রেবা গেল কই? ওই লোকটার কাছে যায় নাই তো, যাকে সে চৈতী বলে চালিয়ে দেয় এবং যার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোনে কথা বলে? তার কাছে গেলেও তো নাসির ফেরার আগেই রেবার ফেরার কথা। তার মানে কি সে একেবারে চলে গেল! সে যে চলে গেল, বলে গেল না!

নাসির চুপ করে বসে থাকে। জয়তুন বলে, 'আপনে বসেন। আমি চা দেই। খালা বইলা গেছে। আর আমি কাকরে রুটি খাওয়াইছি। আপনেরে কাকগুলান খুঁজছে। অনেক কা কা করছে।' জয়তুন মাথা চুলকাচ্ছে। মেয়েটার মাথায় কি উঁকুন হলো!

'তোর খালা কই গেছে?'

'বইলা যায় নাই। বলছে, আমি তাড়াতাড়িই আইসা পড়ব। খালুরে চিন্তা করতে না করিস।'

চিন্তা করতে নিষেধ করেছে। তাহলে নিশ্চয়ই ফিরবে।

নাসির খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়। রেবা আসে কিছুক্ষণের মধ্যেই। মাথায় স্কার্ফ জড়ানো।

স্কার্ফ খুলতে খুলতে সে বলে, 'শোনো। হুজুরের ওখানে গিয়েছিলাম। তুমি কিন্তু রাগ করো না। স্বামী রাগ করলে তো আর হুজুরের দোয়া কবুল হবে না।'

'না রাগ করি নাই। রাগ করব কেন?' নাসির নির্লিপ্ত স্বরে বলে।

'চিনি পড়া দিয়েছেন। শরবত বানিয়ে দিই। তোমাকে খেতে হবে। তোমাকে না জানিয়েও খাওয়াতে পারতাম, কিন্তু নিয়ৎ হল আসল.., নিয়ৎ করে খাবো।'

'দিও, খাবো।'

'তুমি এত সহজেই রাজি হয়ে যাচ্ছ, তুমি মনে হয় বিশ্বাস করতে পারছ না?'

'না, করতে পারছি।'

'ঠিক আছে, তুমি বসো, আমি শরবত বানিয়ে আনি।'

রেবা চলে যায়। শরবত বানাচ্ছে মেয়েটা। একটা বাচ্চা কি অনেক কিছু? প্রাণীমাত্রই বংশবিস্তার করতে চায়! ফুল যে সুন্দর, সৌরভময়, তার কারণ সে পতঙ্গকে আকৃষ্ট করে তার পরাগ ছড়ানোর জন্যে, মেয়েরা যে সুন্দর, তাও পুরুষকে আকৃষ্ট করবারই জন্যে, পুরুষও যে নিজের প্রতাপ-প্রতিপত্তি অর্জন করে, সেটাও বিপরীত লিঙ্গকে মোহিত করতেই। এর সব কিছুর মূলে একটাই ঘটনা, বংশবিস্তার। এটা না থাকলে পৃথিবী শুষ্ক মরুতে পরিণত হতো। কিন্তু একটা সন্তান না থাকলে একটা নারী বা পুরুষের জীবনে কী এমন সমস্যা! নাসির আলী শুধু একটাই সমস্যা দেখতে পাচ্ছে, তা হলো রেবার অনন্ত অবসর। রেবার করার কিছু নাই। রেবা যদি একটা চাকরি-বাকরি করত, তাহলে হয়তো এই সমস্যা আর সমস্যাই থাকত না!

চাকরি একটা আশ্চর্য প্রপঞ্চ। নারীদের ক্ষেত্রে কী হয়, নাসির জানে না, কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে এ রকম অনেক হয় যে, জীবন আর জীবিকা আলাদা করা যায় না। একটা লোক কী উদ্বিগ্ন আর সিরিয়াস থাকে তার চাকরি নিয়ে। অফিসে যাবার সময় এলেই তার পা নিশপিশ করতে শুরু করে। কাফকার একটা গল্প আছে, মেটামরফসিস, সেখানে পোকায় পরিণত হবার পরেও গ্রেগরি সামসা অফিস যাওয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন বোধ করে, নিজে যে পোকায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে, তা নিয়ে তার যত ভাবনা, তারও চেয়ে বেশি ভাবনা অফিস নিয়ে। অফিস অফিস করে একটা লোক তার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করতে পারে। এমন না যে সে টাকাটাকে মুখ্য করে দেখে। টাকাটা আসে, সেটা একটা বড় প্রেষণা, কিন্তু যদি বলা হয়, অফিসে আসতে হবে না, মাস শেষে বেতন বাসায় পৌঁছে যাবে, চাকুরিতে একবার অভ্যস্ত হয়ে পড়া লোক সেটা মেনে নিতে পারবে না। অফিসটাইমে সে বাসায় শুয়ে-বসে কাটাতে পারবেই না, এটা অসম্ভব। মেয়েদের ক্ষেত্রে অবশ্য নাসির তার মা-খালার জীবনে দেখে এসেছে, সংসারধর্ম প্রতিপালন করাটা রক্তের মধ্যে ঢুকে যাওয়া এক রকম অবিনাশী, অদম্য, নাছোড় বিষের মতো। যেখানেই যাবেন, গৃহিণী গৃহকর্ম করতে বসেন। এমনকি বেড়াতে গিয়েও তাঁর ঘরকন্না করা চাই।

রেবার ক্ষেত্রে হয়তো কথাটা সত্য। শুধু ওই ফোনালাপটা যদি সে চালিয়ে না যেত! শুধু কি ফোন কল পর্যন্তই? নাকি তারা গোপনে দেখা সাক্ষাৎও করে! সারাদিন নাসির বাসায় থাকে না, ওই সময় বেটা পুরুষ পুঙ্গব যদি তার ফ্লাটে আসেই, সে ধরবে কেমন করে?

তবে ফোন তো ইদানীং নাসিরের কাছেও আসছে। তার অফিসের ফোনে প্রায়ই একটা ফোন আসে।

ব্যাপারটা শুরু হয়েছে খুবই আকস্মিকভাবে। নাসির অফিসে ছিল, তার আসনেই, কম্পিউটারে বসে একটা অফিসের কাজই সে করছিল, ফোন বেজে উঠল। নাসির ফোন তুলে বলল, 'হ্যালো।'

একটা নারীকণ্ঠ: 'হামিদ বলছেন?'

নাসির বিস্মিত, 'এ নম্বর আপনি কোথায় পেলেন?'

নারীকণ্ঠ বলল, 'আপনি হামিদ বলছেন কি না বলেন।'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে মনে করতে পারছেন না? আমি লিজি। ওই যে কাশেম সাহেবের পার্টিতে দেখা হল। আপনি আমাকে ফোন নম্বর দিলেন।'

'হ্যাঁ, স্যরি, ভুলে গিয়েছিলাম। আপনি কেমন আছেন?' নাসির কথা বলতে বলতে মনের ফাইলগুলোতে সার্চ দিল। না এমন কোনো ঘটনার কথা তার মনে পড়ছে না। সে কি ইদানীং পার্টির মহিলাদের কাছেও নিজেকে হামিদ বলে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে নাকি! আশ্চর্য তো!

নারীটি বলে চলেছেন, 'আছি আর কী? একলা মানুষের অনেক সমস্যা। মাঝেমধ্যে এমন নিঃসঙ্গ লাগে!'

'আপনি একা নাকি?'

'ভীষণ একা। মেন্টালি।'

'আমরা সবাই একা। একা ভাবলেই একা।'

'আমাকে ভাবতে হয় না। আমি না ভেবেও বলে দিতে পারি আমি একা।'

'তাহলে তো চিন্তার কথা।'

'হ্যাঁ জানেন, রাতের বেলা ঠাণ্ডায় আমার পা বরফ হয়ে থাকে, কেউ নেই যে ঘষে ঘষে পা দুটো গরম করে দিতে পারে। আমি ভীষণ একা। মেন্টালি এন্ড ফিজিকালি।'

'নেই কেন?'

‘ও মা, সেদিন আপনাকে বললাম না?’

‘হ্যাঁ বলেছিলেন। কী যেন বলেছিলেন..?’

‘ও মা, আপনি আমার কথা মন দিয়ে শোনেননি? কেন শোনেননি?

‘শুনেছি। কিন্তু ভুলে গেছি।’

‘তার মানে আমাকে আপনার আকর্ষণীয় মনে হয়নি। আমি কি খুবই ডাল দেখতে?’

‘না, না। আপনি খুব সুন্দর।’

‘আমার ফিগার খুবই ভালো। ৩৬ ২৪ ৩৫। বুঝতে পারছেন?’

‘জি.. মানে..!’

‘তবে হ্যাঁ। হাইটটা আরেকটু বেশি হলে ভালো হতো। তবু শাড়ি পরলে হিল পরি, তখন সেটা কভার হয়ে যায়।’

‘হুম।’

‘আমি তো ভেবেছিলাম আপনি আমাকে পছন্দ করেছেন।’

‘কী করে বুঝলেন?’

‘আপনি আমার বুকের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন..!’

রেবা শরবত নিয়ে আসে। নাসির আলী বিসমিল্লাহ বলে শরবত খায়। সে জানে, এসবে কিছু হবে না। সমস্যা তার শরীরে। শুক্রাণু কম।

একটা মাত্র ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করতে কোটি কোটি শুক্রাণু ছুটে চলে। তার ক্ষেত্রে শুক্রাণুর সংখ্যা কম বলে সেখান থেকে একটা গিয়ে ডিম্বানু পর্যন্ত পৌছাতে পারে না। তাহলে কি কোয়ানটিটিও একটা ব্যাপার? এই সব স্পার্মেরই একটা যদি বেশ শক্তিশালী আর দ্রুতগামী হতো, তাহলে কি সে সবার আগে দৌড়ে গিয়ে লক্ষ্যে পৌছাতে পারত না! সেক্ষেত্রে স্পার্মোজয়েড বেশি হওয়ার দরকার কী!

এখন যদি সত্যি সত্যি রেবার পেটে বাচ্চা এসে যায়, তাহলে ঘটনা কী ঘটবে? ব্যাংককের ডাক্তাররা তাকে নিশ্চিত করেছেন, সে বাবা হতে পারবে না। এখন যদি রেবা মা হয়েই যায়, সেটা কি নাসিরের জন্যে আরো বড়ো সংকট তৈরি করবে না? তখন তার সামনে সমস্যা হিসেবে এসে দাঁড়াবে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া যে, চারজনের মধ্যে কে রেবার সন্তানের আসল বাবা?

সম্ভাব্য পিতা চার জন হলো:

১. নাসির আলী
২. মাজারের খাদেম
৩. টেলিফোনে রেবার প্রেমিক
৪. হামিদ আলী।

হামিদ আলীর নামটা মনে হওয়াতেই নাসির আলী একটু আরাম পায়। তাই তো। নাসির আলীর বাবা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু হামিদ আলীর তো থাকতে পারে। হামিদ আলী যদি রেবার সন্তানের পিতৃত্ব অর্জন ও কায়েম করতে সক্ষম হয়, ব্যাপারটা সে মেনে নেবে। নাসির আলী হামিদ আলীকে সহ্য করতে পারে। এখন হামিদ আলী নাসির আলীকে সইতে পারলেই হয়!



অফিসে বসে আছে নাসির আলী। এই একটা অফিস, যেখানে কাউকে কোনো রকমের কাজ করতে হয় না। বড় একটা ঘর, দুটো সেক্রেটারিয়েট টেবিল, টেবিলে কম্পিউটার, মাথার ওপরে ফ্যান, পাশেই কেরানীর কক্ষ, একজন অফিস সহকারীর বসবার টুল, দেয়ালে ঝোলানো সরকারি ক্যালেন্ডার, গবাক্ষে মাকড়সার জাল। বারান্দায় নামাজের জায়গা। তারও ওই পাশে চা বানানোর পরিসর, সেইখানে গামলার কালো পানিতে কাপ-পিরিচ ধোবার ব্যবস্থা।

অফিসকক্ষের ভেতরে নাসির আর মামুন ঝিমোয়। তাদের কাজ হলো গবেষণা, তারা বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কিন্তু তাদের করবার জন্যে নির্দিষ্ট কোনো কাজ নাই। কী করতে পারে? মামুন সেদিন ইন্টারনেট থেকে একটা কৌতুক নামিয়েছিল। এক লোকের অণ্ডকোষ নাই। সে একটা অফিসে যোগ দিয়েছে নতুন। সে বসকে জিজ্ঞেস করল, তাকে রোজ কয়টার সময় অফিসে আসতে হবে। বস বললেন, 'অন্যদের জন্যে অফিস শুরু হয় সকাল ৯টা থেকে। তবে আপনার ১১টার আগে আসার দরকার নাই।'

'কেন?'

'কারণ প্রথম দুই ঘন্টা অফিসের সবাই অণ্ডদেশ কুণ্ডয়ন করে। আপনার তো ওই বালাই নাই। কাজেই আপনি নিশ্চিন্তে দুই ঘণ্টা পরে আসতে পারেন।'

এই একটা অফিসে নাসির আলীদের সারাদিনই কোনো কাজ নেই, তারা যদি তাদের শরীরের কোনো অংশ চুলকাতে আরম্ভ করে, দুইদিনেই সেটা ক্ষয় হতে হতে নাই হয়ে যাবে।

নাসির আলী ফোনের জন্যে অপেক্ষা করছে।

প্রথমে ফোন করে রেবা। 'কী করছ?'

ইচিং মাই বলস। মনে মনে বলে নাসির। মুখে বলে, 'কম্পিউটারে একটা প্রবন্ধ লিখছি। একটা সায়েন্টিফিক জার্নালে পাঠাব। দেখি, ছাপা হয় কি না। তুমি কী কর?'

'এই তো। অর্কিডগুলোতে স্প্রে করলাম। শোনো, অর্কিডের মেডিসিন শেষ হয়ে গেছে। কোনো একটা নার্সারি থেকে এনে দিও তো।'

'আচ্ছা, দিব।'

'রাখব ফোন? তুমি ব্যস্ত?'

'তা তো একটু ব্যস্তই। বললাম না, আর্টিকেল লিখছি?'

রেবা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, 'তোমার কি আমার সাথে কোনো গল্প করতেই ইচ্ছা করে না?'

'কী গল্প করব?' নাসির ক্লান্তভঙ্গিতে বলে।

'সেটা কি আমি শিখায়ে দিব? তুমি গল্প করো।'

'এইবার মনে হচ্ছে শীত কমই পড়বে, কি বল?'

'এই তোমার গল্প? আবহাওয়া নিয়ে? অন্য কোনো গল্প নাই?'

'গল্প! আচ্ছা করব আরেকদিন। আজকে আর্টিকেলটা..।'

'আমার সাথে তোমার কোনো কথা নাই?'

'তোমার সাথে তো রাতেই দেখা হবে। এখন ওই আর্টিকেলটা..।'

'তুমি তোমার আর্টিকেল নিয়েই থাকো। আচ্ছা রাখলাম।' রেবা ফোন কেটে দেয়।

একটু পরে লিজির ফোন আসে।

লিজি বলে, 'কী করছেন?'

'আমি? আপনার ফোনের জন্যে ওয়েট করছি।' মামুন যাতে না শুনতে পায়, এমনি নিচু গলায় বলে নাসির।

'হামিদ ভাই, কাল রাতে আপনাকে স্বপ্নে দেখেছি।' লিজিও কথা বলে ফিসফিসিয়ে।

'তাই নাকি! কী দেখলেন?'

'দেখলাম, আপনি বললেন, এই লিজি, তুমি নিচে কেন? উপরে ওঠো। নারীরা চিরদিন পুরুষের নিচে পড়ে থাকবে সেই দিন শেষ। আমি বললাম, এর মানে কী? আপনি বললেন, মানে বুঝলেন না? আচ্ছা বোঝাচ্ছি। তখনই আমার ঘুম ভেঙে গেল।' বাতাসের মতো হাল্কা স্বরে বলে লিজি।

'ভাগ্যিস!' নাসির আলী বলে।

'কী বললেন? আপনি চান না নারীরা উপরে উঠে আসুক!' এবার সে কথা বলছে স্বাভাবিক স্বরে।

'না, তা চাই। কিন্তু..।'

'কী কিন্তু?'

'কিন্তু সেটার মানে এই নয় যে আপনি আমার উপরে..!'

'ও, আপনি চান নারীরা উপরে উঠুক। কিন্তু আমি চিরকাল আপনার নিচে পড়ে থাকি, এই তো?

'না, মানেটা তাও নয়।'

'মানে তাহলে কী?'

'মানে একটা আছে। কিন্তু আপনি যেটা বোঝাতে চাচ্ছেন সেটা না।'

'আমি কী বোঝাতে চাচ্ছি?'

'সেটা আমি কী করে বলব?'

'না, আপনি বললেন না, আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি সেটা না? আপনাকে বলতে হবে আমি কী বোঝাতে চাচ্ছি।'

'আমি ব্যাপারটাকে পাওয়ার এন্ড পলিটিক্সের দিক থেকে দেখতে চাই। আর আপনি তো..।'

'আমি তো..?'

'না থাক।'

'শোনেন। আপনি আজকেই আমার বাসায় চলে আসেন। আমার শাশুড়ির গলব্লাডার স্টোন। ওনাকে হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে। আমার দেবর রাতে হসপিটালেই থাকে। সারা রাত পুরো বাসায় আমি একা। সন্ধ্যার সময় চলে আসেন। ব্যাপারটা হাতে-কলমে আপনি আমাকে বোঝাবেন..!' আবার লিজির কণ্ঠে মাদকতা।

ক্রিং ক্রিং।

পিএবিএক্স ফোন আসে। 'এক মিনিট..,' বলে নাসির ইন্টারকমের রিসিভারটা তোলে।

'হ্যালো,' ইন্টারকমে নাসির বলে।

'নাসির সাহেব।' বসের গলা।

'স্যার।'

'আজকে রাত্রিবেলায় আপনার কোনো এপয়েন্টমেন্ট আছে?' বস জিজ্ঞেস করেন।

নাসির আলী বিনয়ের সঙ্গে বলে, 'না স্যার, তেমন কিছু তো মনে করতে পারছি না।'

'রাত ৮ টার ফ্লাইটে জন আসবে। আপনি কি তাকে রিসিভ করতে পারবেন?'

'যদি বলেন স্যার.. ।' নাসির আলী অনুগত কর্মকর্তার মতো করেই হাত কচলায়।

'কোন জন বুঝছেন তো?' আমাদেরকে যে একটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রজেক্ট দেবার কথা, এই জন কিন্তু সেইটা অ্যাপ্রুভ করবে। ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট পারসন, বুঝতেই পারছেন।'

'অবশ্যই স্যার।'

'আপনি তাকে রাতে এয়ারপোর্টে গিয়ে রিসিভ করবেন। পারবেন না?'

'পারব স্যার।' নাসির আলীর কণ্ঠে সরকারি চাকুরের আনুগত্য।

'এয়ারপোর্টে রিসিভ করে ওনাকে গুলশানের রেস্ট হাউজে দিয়ে আপনি চলে যাবেন। সাড়ে নটার মধ্যেই ছাড়া পাবেন। যাবার সময় অফিস থেকে গাড়ি নিয়ে যাবেন।' বস এইবার আদেশের সুরে বলেন।

'ওকে স্যার।'

'ফ্লাইট ইনকোয়ারিতে ফোন করে যাবেন, ফ্লাইট ডিলে হলে আমাকে জানাবেন। তবে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ তো। ডিলে হবে না। দুই-চার মিনিট আগেই এসে যাবে দেখবেন।' উপদেশ দেওয়া কেবল ঊর্ধ্বতনদেরই সাজে।

'আচ্ছা স্যার।' নাসির তার কর্তার প্রতিটা কথায় সম্মতি আর সমর্থন প্রকাশ অব্যাহত রাখে।

বস ফোন রাখলে নাসির লিজির ফোনটা তুলে বলে, 'হ্যালো..!'

না লিজি নাই। সে ফোন রেখে দেয়। একটু পরে লিজিই করবে। আজ সে যে রকম তপ্ত হয়ে আছে..!

তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? সে সহজেই কার পুল থেকে গাড়ি নিতে পারবে। রেবাকে বলতে পারবে সে এয়ারপোর্ট যাচ্ছে। আর লিজিকে বলতে পারবে, রেডি হয়ে থাকতে। সাড়ে ৬টা থেকে সাড়ে ৭টা পর্যন্ত লিজির ফ্লাটে। সেখান থেকে সোজা এয়ারপোর্টে।

ধারণাটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে নাসির আলী ঘামতে শুরু করে। তার জিভ শুকিয়ে আসছে। তার চোখের পাতা পিটপিট করতে থাকে।

লিজির ফোন আসে। 'হামিদ ভাই, তুমি আসছ তো?'

এর আগে পর্যন্ত সম্বোধনটা ছিল আপনি। লিজি আপনি থেকে তুমিতে চলে এলো! তাহলে সেও তুমি বলবে, নাসির দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়, 'হ্যাঁ। তুমি অ্যাড্রেসটা বলো..'

'না, অ্যাড্রেস লাগবে না। তুমি ইস্টার্ন প্লাজার সামনে আসো। আমিও থাকব। আমি একটা হলুদ শাড়ি পরে থাকব। আমার হাতে থাকবে একটা কালো রঙের ব্যাগ। আর আমি মাথায় একটা টকটকে লাল স্কার্ফ বাঁধব। সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে থাকব।'

'কখন?'

'তুমি যখন বলবে।'

'ঠিক সাড়ে ৫টায় তাহলে...এই না। তুমি এসো না। আমার সঙ্গে অফিসের গাড়ি থাকবে। ড্রাইভার থাকবে। তুমি বরং বাড়িতেই থাকো। আমিই আসি...'

'হামিদ ভাই, ড্রাইভারকে বলবে আমি তোমার বোন...'

'না দরকার কী...'

ফোন রেখে নাসির পানির তৃষ্ণা অনুভব করে। বোতল থেকে ঢেলে পানি খায়। আচ্ছা লিজির কাছে যে সে যাবে, সে কি নিরোধক কিনে নিয়ে যাবে? সেটা কি খুব খারাপ দেখাবে না? মেয়েটি তাকে ডাকছে, কেন ডাকছে! নিছক গল্প করার জন্যেও তো ডাকতে পারে। এখনই না বলল, বলবে তোমার বোন! বোন। কিন্তু ফোনে সে যেসব কথা বলে, যেভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সেটা কোনো বোন তার ভাইকে কোনোদিনও বলতে পারবে না! তাই বলে পকেটে নিরোধক নিয়ে কেউ কোনো বাড়িতে যেতে পারে। চূড়ান্ত মুহূর্তে সে কী করে বলবে, আমার কাছে আছে। আমি প্যাকেট ছিঁড়ছি! বলা যায় এই কথা! আবার অন্যদিক থেকে দেখলে, ঘটনা যদি নিজের গতিতে ছুটতে থাকে, চূড়ান্ত মুহূর্তটি যদি এসেই যায়, তখন শুধু মাত্র দুটাকার একটা রবারের অভাবে সে কি ফিরে আসবে। নিরোধক ছাড়া এই রকম একজন প্রোষিতভর্তৃকার সঙ্গে উপগত হওয়া হবে চরম বোকামি। জীবনের এই একটিমাত্র ভুল তাকে ঠেলে দিতে পারে সেই অসুখটার দিকে, যা হলে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো পরিণতি নাই।

একদিক থেকে ভাবতে গেলে, ওই অসুখটার আরেক নাম জন্ম। জন্মমাত্রই তো প্রাণী একটা মাত্র পরিণতিকে অমোঘভাবে অদৃষ্টে ধারণ করে, তার নাম মৃত্যু।

হ্যাঁ ওই ব্যাধিটির ভয় ছাড়া অন্য কোনো কারণে নিরোধক ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন অন্তত নাসিরের নাই, কারণ তার স্পার্মোজয়েডের সংখ্যা কম।

নাসির বেরুবে এখন। রেবাকে বলা দরকার যে, ফিরতে তার রাত হবে। বেশ রাত। আসলে এই বেটা জন কখন এসে পৌঁছাবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং রেবা যেন তার জন্যে অপেক্ষা না করে। দুশ্চিন্তা না করে।

নাসির ফোন তোলে। নিজের বাড়ির নাম্বারে ডায়াল করে। এনগেজড। খানিকক্ষণ পরে আবার ফোন ঘোরায় সে। আবারও এনগেজড। এইবার তার মাথায় একটা অন্য ফন্দি খেলা করে। পকেট থেকে তার ছোট্ট নোটবুকটা বের করে সে। রেবার ওই টেলিফোন-প্রেমিকের নাম্বার লেখা আছে এই নোটবুকে। ফোন নাম্বারটা সে নিজের কলারআইডি ফোন থেকে কপি করে রেখেছিল। সে ওই প্রেমিকের নাম্বারে ডায়াল করলে টুটু টুটু টুটু আওয়াজ শুনতে পায়। সেই আওয়াজ কানের ভেতর দিয়ে তার মস্তিষ্কের কোন বিশেষ সার্কিটে গিয়ে হানা দেয়। তার হাত-পা অবশ হয়ে এলে সে নিজের আসনে এলিয়ে পড়ে।

তার মনে প্রশ্ন জাগে, পৃথিবীটা কি সত্যি কমলালেবুর মতো গোল? যদি তা সত্য হয়, আমরা, মানুষেরা, গরুছাগল, বাড়িঘর, আমরা কীভাবে আছি ওই কমলালেবুটায়! আমরা কি কমলালেবুর গায়ে হেঁটে চলা একটা পিঁপড়ার মতো ঝুলছি? নাকি ওর পেটের বীজ ও কোয়ার মতো নিরাপদে ঠাসাঠাসি গাদাগাদি করে আছি?

নাসির আলী নাকি হামিদ আলী সে? হামিদ আলী। হামিদ আলী। সে লিফট বেয়ে নামে। লিফটে আজ একদম ভিড় নাই। লিফটের ভেতরের আয়নায় সে নিজের চেহারা দেখে এবং নিশ্চিত হয় যে সে হামিদ আলী। হামিদ আলী নাকি নাসির আলী, লিফট থেকে নামে।

গ্রাউন্ড ফ্লোরের সিঁড়িটা, যেটা বিল্ডিং থেকে ভূমিতে তাকে নামিয়ে দেবে, সেটায় দাঁড়িয়ে সে আকাশটাকে দেখে। সে নিশ্চিত হয়, আকাশ আসলে তৈরি ধাতু দিয়ে, ইস্পাত বা টিন, এই রকম কোনো ধাতু। তাহলে তারা এই রকম একটা ধাতুনির্মিত গোল তাঁবুর নিচে মাটিতে বেশ আরামের মধ্যেই আছে। এখান থেকে পড়ে যাবার কোনো সম্ভাবনা তাদের নাই।

একজন হাসিমাখা মুখ নিয়ে এগিয়ে আসে। বেলা সাড়ে তিনটার হলুদ রোদে তার দাঁতগুলোকে সোনায় বাঁধানো বলে মনে হচ্ছে। সে তার দিকে তাকিয়ে সোনালি হাসি ছুড়ে দেয়, 'সালামালেকুম.. ।'

নাসির বলে, 'ওয়ালাইকুম আসসালাম। ফারুক সাহেব কেমন আছেন?'

'জি ভালো' বলে আগন্তুক এমনভাবে তাকায়, যেন সে তাকে চেনে না।

'চিনতে পারছেন, আমি হামিদ?'

'হামিদ ভাই, আপনি আমাকে আপনি আপনি করে বলছেন কেন?'

'চিনতে পারছ, আমি হামিদ?'

'আরে হামিদ ভাই, আপনাকে চিনব না? শোনেন না। কী হইছে.., এই বিল্ডিঙে আরেকজন কাজ করে আপনার মতো দেখতে.. ।'

'তাই নাকি?'

'সেদিন তো আপনি মনে করে তাকে হামিদ ভাই হামিদ ভাই বলে একেবারে.. ।'

'একেবারে কী?'

'না মানে, তেমন কিছু না। হামিদ ভাই, আপনি যেন কোন সেকশনে আছেন?'

'আমি? আমি আছি...সায়েন্টিফিক অফিসার, গবেষণা.. ।'

'ও আচ্ছা। ওখানে একজন আছেন আমার পরিচিত। নাসির ভাই। তাকে চিনেন?'

'নাসির.. নাসির..কোন নাসির, বলেন তো? কুমিল্লার নাসির?'

'কুমিল্লার কি না তা তো বলতে পারব না। আপনারই মতো দেখতে.. ।'

'আমার মতো দেখতে হলে তো আমিই। তাই না?'

'যাই হামিদ ভাই, তাড়া আছে.. ।'

ফারুক দ্রুত চলে যায়। ফারুক এইভাবে চলে গেল কেন, সে ভেবে পায় না।

সে হাঁটে। সচিবালয়ের সদর ফটক পেরিয়ে রাস্তায় আসে। আজ সে বাসে উঠবে না। রিকশা নেবে না। ট্যাক্সিও না। আজ সে হাঁটবে। পল্টনের ভিড় ঠেলে, জনারণ্যে একটা মানববৃক্ষ, জঙ্গম, বেশ আত্মবিশ্বাসী পায়ে, হাঁটে।

সূর্য তার পিছে পিছে হাঁটলে সে মজা পায়। ইস্পাতের আকাশে

সূর্যটাকে যে ঘড়ির কাঁটার মতো ঘোরানো হচ্ছে, এই ধরনের একটা ধারণাও সে আবিষ্কার করে ফেলে।

ফুটপাথের পাশেই একটা ঝুপড়ি হোটেল। পাশে রিকশা দাঁড় করিয়ে রেখে রিকশাওয়ালারা গুড় দিয়ে রুটি খাচ্ছে। একজন দশাসই মহিলা, কালো ও মোটা, আঁচলে একগোছা চাবি, মধুর করে হাসছে। কালো মুখে অমলিন দাঁতের সারি, মনে হচ্ছে জাফলং সীমান্তের ওপারে, কালো কালো ভারতীয় পাহাড়ের গা থেকে ঝর্নাধারা নেমে আসছে আর রোদে ঝিকমিক করছে। সেই হাসি তাকে আকর্ষণ করে। সে বসে যায় হোটেলের কাঠের বেঞ্চে।

'কী চান?' মহিলা হাসে।

'রুটি দেও।'

'সাথে কী লইবেন? গুড় না মরিচবাটা?'

'গুড় দেও।'

নোংরা গেলাসে কলসির পানি ঢালে মহিলা। নাসিরের সামনে রাখে। নাসির গুড় দিয়ে রুটি খায়। পানিটা খাবে কি না ভাবে।

একজন রিকশাওয়ালা, সে শুটকি-মরিচ ভর্তা দিয়ে রুটি খেতে খেতে তাকে জিজ্ঞেস করে, 'স্যারে ক্যান আইছেন, ভোট চাইতে?'

'না, পেটের খিদায়। আপনি কী করেন?' নাসির আলী হেসে বলে।

'রিকশা চালাই। ওই যে রিকশা..।' রিকশাওয়ালাটির পিঠ ধনুকের মতো বাঁকা, সে একটু দূরে দাঁড় করানো একটা রিকশা দেখায়। রিকশাটা রংদার।

'যাবেন?' নাসির আলী বলে।

রিকশাওয়ালা মুখে রুটি চালান দিয়ে বলে, 'যামু। কিন্তু দেরি হইব।'

'ক্যান, দেরি হইব ক্যান?'

'প্যাট ভইরা খামু। খাইয়া একটু চা খামু। চা খাইয়া একটা সিগারেট ধরামু। তারপর বারামু।'

নাসির বলে, 'আমার তাড়া নাই। আপনি আরাম করে খান। তারপর চলেন।'

'কই যাইবেন?'

'আপনি বলেন, আপনি কোথায় যাবেন।'

রিকশাওয়ালা বলে, 'কথাটার মাজেজা বুঝলাম না।'

নাসির আলীও শূন্যে হাত ছুড়ে বলে, 'আমি এখনও ঠিক করি নাই কই যাব। আপনি খান। আপনি খেতে খেতে আমি ঠিক ভেবে বের করতে পারব, কোথায় যাওয়া যায়।'

রিকশাওয়ালা রুটি খেয়ে বলে, 'চলেন।'

'চা খেয়ে নেন।'

'না, এখন আর চা খামু না।,

'ক্যান খাবেন না? মাইন্ড করছেন?'

'না করি নাই।'

'তাইলে চা খান।'

'না, চা খামু পরে।'

'তাইলে সিগারেট ধরান।'

'প্যাসেঞ্জার সিটে বহাইয়া সিগারেট ধরানের নিয়ম নাই।'

'আমিও একটা ধরাব।'

'আচ্ছা ধরান।'

'এই, একটা সিগারেট দেও।' নাসির বিক্রেতা-মহিলার উদ্দেশে বলে।

মহিলা বলে, 'আপনের খাওনের সিকারেট এইহানে নাই।'

'আমি কী সিগারেট খাই?'

'সেইটা আমি ক্যামনে কমু!'

'তাইলে যেইটা আছে, সেইটাই দেন।'

'ইস্টার ফিল্টার খাইবেন?'

'দেন না আপনি।'

মহিলা সিগারেট বাড়িয়ে দিলে সে মুশকিলে পড়ে, কারণ সে সিগারেটে অভ্যস্ত নয় বলে জিনিসটা কী করে ধরাতে হয়, সে ঠিক কায়দাটা জানে না। মহিলা তাকে লাইটার এগিয়ে দিলে সে আরো মুশকিলে পড়ে। কারণ লাইটার জিনিসটা সে এক তুড়িতে জ্বালাতে পারে না।

সে রিকশাওয়ালার দিকে লাইটার এগিয়ে দিয়ে বলে, 'নেন আপনি ধরান।' রিকশাওয়ালা লাইটার জ্বালিয়ে আগুন তার দিকে বাড়িয়ে দিলে সে ঠোঁটে সিগারেট ধরে এবং সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে।

প্রথম টানটা জোরে দেওয়ায় তার কাশি হয় আর চোখে-মুখে পানি চলে আসে। সে সিগারেটটা হাতে নিয়ে মানিব্যাগ বের করে আর মহিলার দিকে জিজ্ঞাসু নয়নে তাকায়। মহিলা টাকার অঙ্ক বললে সে বিস্মিত হয়, কারণ

বিল হয়েছে খুবই কম টাকার। সে বিশটাকার নোট মহিলার হাতে দিয়ে বাকি টাকা না নিয়েই উঠে পড়ে।

রিকশাওয়ালা রিকশার হাতলে হাত রেখে তাকে ইংগিত করে: 'উঠেন।'

সে রিকশার পেছনের সিটে বসে।

'কোনদিকে যামু? ডাইনে না বাঁয়ে?

'বাঁয়ে।' জটিলতা এড়াতে সে বলে।

রিকশাওয়ালা তার সিটে উঠে প্যাডেলে পা দেয়। তার পরনে শুধুই একটা শার্ট। তার ঠাণ্ডা লাগে না? সে ভাবে।

কিছুক্ষণ চলার পর রিকশাওয়ালা বলে, 'কোন দিকে যামু?'

সে, নাসির/হামিদ, রিকশাওয়ালার পিঠে হাত দিয়ে বলে, 'আপনি পিছনের সিটে বসেন। আমি চালাই।'

রিকশাওয়ালা হাসে, 'আপনে তো পাগলা-চোদা আছেন! পারতেন না। হ্যান্ডেল বাঁইকা গাড়ি একদিকে দৌড়ানি দিব। নিজেও মরবেন গরিবরেও মারবেন।'

'আরে পারব। স্টুডেন্ট অবস্থায় শখ কইরা বহুত চালাইছি।'

'পারবেন না।'

'পারব। তুমি নামো তো!'

'আপনের মাথা খারাপ।'

'আমার তো মাথা খারাপ না। আমার মাথা ঠিক আছে। আরে মিয়া তুমি নামো। পেছনে বসো। দ্যাখো আমি চালাইতে পারি কিনা। কত চালাইছি। আরে মিয়া বড়লোকের নানান শখ আছে। শখের দাম লাখ টাকা। এখন তুমি পেছনের সিটে আসো। আমি চালাই। তোমারে ২০০ টাকা দিব।'

রিকশাওয়ালা নামে। তারা আসন বদল করে।

রিকশা চালানো সত্যিই কঠিন। কিন্তু সেটা জীবন চালানোর চেয়ে কঠিন নয়। রিকশাটা সত্যি বাঁ দিকে বেঁকে যেতে চাইছে। নিয়ন্ত্রণ রাখা খুব মুশকিল।

রিকশা নিয়ে তারা যায় টঙ্গী ডাইভার্সন রোডে। রাস্তার ধারে একদল টোকাই একটা ফুটবল নিয়ে হইচই করে খেলছে। এক চিলতে একটুখানি জায়গা বিলের ধারে। পাশেই বাঁশের স্তূপ।

নাসির/হামিদ রিকশা থামায়। রিকশাওয়ালাকে ২০০ টাকা বের করে দিলে রিকশাওয়ালা বলে, 'না। আপনে তো চালাইছেন। আমি এত টাকা নিমু না। আমারে তিরিশ টাকা দেন।' সে তাকে ৫০ টাকার একটা নোট দিয়ে পিচ্চিদের দলে ভেড়ে। বলে, 'এই, আমিও বল খেলব। আমাকে নাও।'

একটা টোকাই বলে, 'না। বড় ম্যান নিমু না। বল ফাইটা যাইব।'

'আরে আমি বড় নাকি? আচ্ছা, বল ফাটলে তোমাদেরকে দুইটা নতুন বল কিনে দেব।'

'আইচ্ছা তাইলে আসেন।'

নাসির/হামিদ টোকাইদের দলে মিশে যায়। ধুলা উড়িয়ে ফুটবল খেলে।

ফুটবল তার প্রিয় খেলা ছিল। ফুটবলে সে বিখ্যাত ছিল গোলকিপার হিসেবে। সারাদিন একা একা দেয়ালে বল ছুড়ে মেরে নিজেই ধরত। এইভাবে চলত তার গোলকিপিং প্র্যাকটিস। ছোটবেলায়। তার একটা ভারি শখ ছিল শিয়ালকোটের ফুটবলের। সেই বলটা তাকে কিনে দিয়েছিলেন পরিতোষ কাকু।

পরিতোষ কাকুর সঙ্গে মার খুব খাতির ছিল। পরিতোষ আসতেন নাসিরকে অঙ্ক শেখাতে।

পরে কী থেকে কী হলো, মা-ই গেল মরে।

মা বিষ খেয়েছিল!

মা কেন বিষ খেয়েছিল?

একদিন ফুটবল কুড়োতে সে ঢুকেছিল খাটের নিচে, সেখান থেকে সে দেখেছিল পরিতোষ কাকু মাকে চুমু খাচ্ছে?

সে সবই খুব ছোটবেলার কথা। নাসির আলী সেসব মনে করতে চায় না। একেবারেই না। বরং সে ফুটবল খেলুক। গোলকিপিং নয়, সে এবার সামনে উঠে গিয়ে খেলবে। আজ সে স্ট্রাইকার। আজ সে নিজেই গোল দেবে।

চিরটা কাল কেন সে গোল আগলে রাখবে। কেন সে গোল হজম করবে। আজ তার স্ট্রাইক করবার দিন। আজ সে গোল দেবে।

বাচ্চাদের সঙ্গেও সে পেরে উঠছে না। একে তো দমে কুলোচ্ছে না। তারপর কোনো বাচ্চার গায়ে যেন সে লাথি না মেরে বসে, সেদিকে খেয়াল

রেখে পা চালাতে হচ্ছে। এইভাবে খেললে কি সে গোল দিতে পারবে! না। তার আরও মরিয়া হয়ে খেলা উচিত। আরও হাত-পা খুলে ছোটা উচিত বলের পেছনে...

পারল কই সারাটা জীবন! সারাটা জীবনই তো নিজেকে গুটিয়ে রাখল, যাতে কারো বুকে সামান্য আঘাতও না লাগে। আজ সে নাসির নয়। আজ সে হামিদ। সে খেলবে। সে বল জোরে মারবে। সে যাবে লিজির কাছে, খুলে ফেলবে তার অন্তর্বাস, খুলে ফেলবে, মেলে ধরবে নিজেকেও। আজ সে স্ট্রাইকার, আজ তার গোল দেবার পালা, আজ সে হামিদ আলী। সে বল মারছে জোরে। হ্যাঁ, সে গোল করতে সক্ষম হয়েছে। পিচ্চিরা তার নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে। আরও গোল। আরও গোল। গোল করার নেশায় পেয়ে বসেছে তাকে।

সময় গড়িয়ে যায়। সন্ধ্যা নেমে আসে। সে ভুলে যায় তার লিজির কাছে যাওয়ার কথা। সে ভুলে যায় যে তার এয়ারপোর্টে যাওয়ার কথা।

হামিদ থেকে নাসিরে ফিরে আসতে তার খানিকক্ষণ দেরি হয়। রাত নয়টার দিকে সে বাড়ি ফিরে আসে। তার সমস্ত শরীরে ধুলো। ঘামে ধুলো বসে কাদা হয়ে আছে হাত-পা। জামার দিকে তো তাকানোই যাচ্ছে না। আজ নিশ্চয়ই রেবা তাকে ভীষণ বকবে।

কিন্তু দোরঘণ্টি বাজা মাত্রই রেবা দৌড়ে আসে।

'এতক্ষণ কোথায় ছিলে?' রেবা ভ্রু কপালে তুলে বলে।

নাসির টিভি-বিজ্ঞাপনের ভাষায় বলে, 'দাগ নাই তো শেখাও নাই।'

'কী শিখলা এতক্ষণ?'

'ফুটবল খেললাম বাচ্চাদের সাথে।'

'কী বলো? আসো আসো! কাপড়চোপড় ছেড়ে গোসল করে নাও।'

রেবা তাকে খুবই যত্ন করে। তাকে গরম পানি দিয়ে যায় বাথরুমে। নানা রকমের ভর্তা করে ভাত খাওয়ায়।

নাসিরের মনে সন্দেহ ঘনীভূত হয়, দেয়ার মাস্ট বি সামথিং রং। ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। রেবা কি তাহলে বাইরে গিয়েছিল? নাকি সে-ই এসেছিল? তারা কি নিরোধক ব্যবহার করেছে? নাকি এইবার রেবা মা হতে পারবে?



বস মহাখাপ্পা। তার ঘরে নিতান্ত গোবেচারা মুখ করে বসে আছে নাসির।

বস তারস্বরে বলেন, 'নাসির, আপনি জানেন আপনি সরকারের কত বড় ক্ষতি করেছেন?'

নাসির মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে থাকে। বসের রিভলভিং চেয়ারের পেছনে তোয়ালেটা কটকটে হলুদ, পেছনে একটা কাবাশরিফের ছবি, টেবিলে টেলিফোন তিনটা, লাল, কালো, সাদা। সেক্রেটারিয়েট টেবিলে কাচ, কাচের নিচে অনেক ভিজিটিং কার্ড। এয়ারকুলার চলছে, তার শব্দ আসছে, অথচ শীতকাল..।

বস দেখতে ছোটখাট, ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, মাথায় ঈষৎ টাক, গোঁফ আছে কি নাই, সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন, সামান্য সাদাপাকার আভাস আছে ঠোঁটের ওপরে ও নাকের নিচে, নাকের রোমও পাকা..।

'জন কালকে ৮টার ফ্লাইটে এসে দেখে এয়ারপোর্টে কেউ নাই। কী কেলেঙ্কারি! শেষে সে আমার বাসায় ফোন করেছে এয়ারপোর্ট থেকে।' বস রাগে কাঁপছেন, তার সমস্ত মুখমণ্ডল লাল।

'কাল স্যার আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গিয়েছিল।' নিতান্তই ভিজে বেড়ালের মতো নাসির মিনমিন করে জবাব দেয়।

'সেটা আপনি আমাকে ফোনে জানাতে পারতেন, আমি অন্য কাউকে এসাইনমেন্ট দিতাম'—বসের রাগ তবু পড়ে না।

'আমার স্যার ফোন করার অবস্থা ছিল না। ইন ফ্যাক্ট আমি স্যার কাল অফিস থেকে নেমেই ... হঠাৎ একটা স্কুটার ...ধাক্কা মারল ...আমি ...তারপর আর কিছু মনে নাই... জ্ঞান ফিরলে দেখি আমি হাসপাতালে...' নাসির বলল। ভাগ্যিস মামুন তাকে ওই খবরটা পড়ে শুনিয়েছিল যে রোজ

সবাই বাড়ি ফিরে যায়, কিন্তু সবাই ফেরে না। এখন অজুহাত হিসেবে সেই প্রসঙ্গটাই কী রকম জুতমতো ব্যবহার করা গেল!

'স্যরি... আমি না জেনে...', বস মুহূর্তেই নরম হয়ে যান।

'ইটস ওকে স্যার। তবে ফল্ট তো আমারই...আপনি তো আমাকে বকা দিবেনই...'

'অ্যাক্সিডেন্ট আসলে আমাদের যেকোনো কারো যে কোনো সময় ঘটে যেতে পারে..। আমার বাবা, জানেন, একদিন অফিস থেকে আর ফিরে আসেননি... পরে তার লাশ পাওয়া গেল মর্গে...', বসের মুখটা বেগুনপোড়ার মতো দেখায়।

'আমি স্যার আপনাকে সত্যি দুঃখ দিয়ে ফেলেছি। স্যরি স্যার..।' আন্তরিক দুঃখপ্রকাশ করে নাসির আলী বলে।

'না ঠিক আছে। যান, মন দিয়ে কাজ করেন।' বস তাকে বিদায় জানায়।

নাসির ওঠে। নিজের ডেস্কে যায়। মামুনের একটা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাচ্ছে। সবাই রোজ ঘরে ফেরে না। অন্তত একজন পাওয়া গেল, যিনি ঘরে না ফিরে মর্গে গিয়েছিলেন।

'শোনা গেল লাশকাটা ঘরে নিয়ে গেছে তারে
কাল রাতে যখন ডুবিয়া গেছে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হলো তার সাধ।'

বধূ শুয়ে ছিল না কো পাশে
শিশু নাহি তার
প্রেম ছিল আশা ছিল নাকি
জোছনায় অতএব সে দেখেছিল ভূত
ঘুম তাই ভেঙে গেল তার
লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।

এই ঘুমই চেয়েছিল সে
এই ঘুম শ্রেয়তর জাগিবার চেয়ে...

নিজের কম্পিউটারে বসে নাসির জীবনানন্দ দাশের বদলে মরণানন্দ দাশের নামে পদ্য রচনা করতে থাকে।

জানি তবু জানি
নারীর হৃদয় যত বিখ্যাত তত বিখ্যাত নয় এই রাজধানী...

আলো-অন্ধকারে যাই
মাথার ভেতরে এক বোধ কাজ করে
নির্বোধের বোধ
তালি শুধু তালি
আমি কি নাসির নাকি আমি হই হামিদ আলী।
আমারই চোখেমুখে কালি।

এই সময় ফোন বাজে।

নাসির তার রিভলভিং চেয়ার ঘুরিয়ে ফোন ধরে— 'হ্যালো।'

'হামিদ..!'

'কে?'

'আমি লিজি!'

'কোন লিজি?'

'হামিদ, দিস ইজ টু মাচ! এক রাতেই আমাকে ভুলে যাবার ভাণ করছ? রাতে বউ কি বেশি আদর করেছে?'

'তা করেছে। দ্যাট ইজ টরচারাস।'

'কেন?'

'কনজুগাল লাইফের ওই ব্যাপারটার মতো টরচারাস আর কিছু নাই।'

'আমি তো সেটা বুঝব না। মাই ম্যান ইজ নট উইথ মি।'

'রাইট। হোয়েন হি উইল বি উইথ ইউ, ইউ উইল এনজয় দিস টু দ্য লাস্ট ড্রপ।'

'বাট আই ক্যান নট বিয়ার দিস লোনলিনেস এনিমোর। আই এম ডায়িং অফ লোনলিনেস। আই উইল ডাই। বাট আই ওয়ানা কিল ইউ।'

'আই উইল কিল ইউ।'

'ইউ হ্যাভ অলরেডি ডান দ্যাট। কাল কেন আসো নি। হোয়াই...বাসায় এখন কেউ নাই। আসো, এসে আমাকে আদর করো।'

'স্যরি। আমি হামিদ নই। আমি নাসির।'

নাসির ফোন কেটে দেয়। ফোনটা তুলে রাখে। নিজের ফোন তুলে রেখে সে মামুনের টেবিলের সেটটা থেকে ডায়াল করে নিজের বাসায়।

ফোন ধরে রেবা।

'হ্যালো, কে?' রেবা বলে।

'আমি হামিদ।'

'কাকে চান?'

'আপনাকেই।'

'আপনি কত নম্বরে ফোন করেছেন?' রেবা ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলে।

'এই নম্বরেই। আপনার নামটা কি জানতে পারি?

আমার নাম..আমার নাম শায়লা.. ।'

'শায়লা.., এই বাড়িটা কোথায়..? ধানমণ্ডিতে..?'

'না কাঁঠালবাগানে। আপনি কোত্থেকে বলছেন..?

'মতিঝিল থেকে.. ।'

'হামিদ সাহেব.., আপনি নিশ্চয় কাজে ফোন করেছেন? আপনার কাজের দেরি হয়ে যাচ্ছে না তো?'

'না। আপনার কোনো জরুরি কাজ নেই তো?'

'না বলেন। জয়তুন, টুলটা এনে দে তো।' (এর মানে সে এখন ম্যারাথন কথা বলবে! নাসির ভাবে)

নাসির বলে, 'আপনার নামটা যেন কী বললেন..?'

রেবা বলে, 'একটু আগে বললাম না?'

'হ্যাঁ, কী বললেন? লায়লা না?'

'লায়লা? আচ্ছা লায়লা...(টুল এসে গেল। সে বসে পড়ল।) আপনাদের কীসের অফিস?'

'আমাদের? এটা একটা অ্যাড ফার্ম.. ।

'আপনারা কি টিভি অ্যাডও বানান?'

'বানাই।'

'মডেলরা আসে আপনাদের এখানে?'

'আসে... আপনিও আসতে পারেন।'

'আমি? কেন?' রেবা আগ্রহী কণ্ঠে বলে।

'মডেলিং করবেন?' নাসিরও ঝানু খেলোয়াড়ের মতো কথার চাল চালে।

'আমার বয়স কত, জানেন?'

'না। কত? ষোল?'

'উঁহুঁ। চব্বিশ।'

'বাড়িয়ে বলছেন।'

'একটু...'

'আপনার গলা শুনে কিন্তু মনে হয় না আপনার বয়স ষোল-সতেরও চেয়ে বেশি হবে।'

'উঁহু। আমার অনেক বয়স।'

'থাক। মেয়েদের বয়স নিয়ে কথা বলতে নেই। আপনি দেখতে নিশ্চয়ই খুব সুন্দর?'

'নিজের মুখে নিজের প্রশংসা করাটা আমার উচিত হবে না। তবে আপনাদের অনেক মডেলকে দেখে আমার হাজব্যান্ড কী বলে জানেন?'

'আপনার হাজবেন্ড আছে?'

'আছে একজন। শোনেন না আমার হাজব্যান্ড কী বলে?'

'বলেন।'

'বলে, ওইসব মডেল তো তোমার নখেরও যোগ্য না।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে। আপনার হাজবেন্ড ঠিকই বলেন।'

'এই, আপনি আমাকে দেখেননি, শোনেননি, আপনি আমার এত প্রশংসা করছেন কেন? আপনি তো ভাই সাংঘাতিক!'

'কী?'

'মেয়েদের সিডিউস করতে পারেন।'

'মডেলদের নিয়ে কারবার। মেয়েরা তো মডেলিং করতে চায় না। নানা কথা বলে তাদের মডেলিং-এ আনতে হয়। আপনাকেও আমি এত কথা বলছি, আপনিও চলে আসেন। সামনে আমাদের একটা অ্যাড বানাতে হবে। আমরা একজন মডেল খুঁজছি।'

'কিসের অ্যাড?'

'এই তো। গুঁড়ো দুধের। আমরা একজন তরুণী মা খুঁজছি।'

'আমি তো মা না। আমার কোনো ছেলেপুলে হয়নি।'

'তাহলে তো আরো ভালো। আপনাকে আমার বিউটি সোপের অ্যাডে নিয়ে নিতে পারব।'

'বিউটি সোপের অ্যাড! বাথরুমে শাওয়ার নেওয়ার সিন করতে হবে। আমি পারব না।'

'সেটা ট্রিক্স করে করা যাবে।'

'আপনি আমাকে দেখেননি। আপনি আমার ফটো পর্যন্ত দেখেননি। অথচ একবার আমাকে গুঁড়ো দুধের অ্যাডে নিচ্ছেন, একবার আমাকে বিউটি সোপের অ্যাডে নিচ্ছেন, আপনার ব্যাপারটা কী?'

'আপনি আপনার ছবি পাঠান। আপনি এসে দেখা করেন। আপনার জন্যে অপশন তো খোলা। শোনেন, আপনাকে যদি আমাদের পছন্দ না হয়, তাহলে তো আপনাকে আমরা নেব না। কিন্তু পছন্দ হলে আমরা অফার করব। আপনি অফার পছন্দ হলে অ্যাড করবেন। না হলে করবেন না। তবে একটা কথা, আপনি যে ম্যারিড, সেটা প্রথমেই ক্লায়েন্টকে আমরা বলব না।'

'কেন? বলবেন না কেন?'

'আরে বোঝেন না, আমাদের ক্লায়েন্টরা ভাবে ম্যারিড মেয়েদের দিয়ে অ্যাড করালে প্রডাক্ট বিক্রি হয় না। অবশ্য দুধের অ্যাডটার কথা আলাদা। ওইটাতে বিবাহিতই দরকার।'

'আপনার ফোন নাম্বারটা দেন। আমি পরে যোগাযোগ করব।'

'নেন লিখে নেন। আমার নাম হামিদ আলী। মিস্টার আলী বলে লোকে এখানে ডাকে আমাকে। বলবেন, মিস্টার আলী আছে? আপনার নাম্বারটাও আপনি দেন। আমিই পরে যোগাযোগ করব।'

'আচ্ছা আমি কি আমার হাজবেন্ডকে নিয়ে আসতে পারি আপনার ওখানে?'

'পারেন। তাতে কী অসুবিধা? তবে, আমরা দুজন যদি বন্ধু হয়ে যেতে পারি, তখন বেচারা হাজবেন্ডকে আর কষ্ট দেওয়ার দরকার পড়বে না।'

'না, আমার হাজবান্ড সেই রকম না। উনি এইসব ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা করবেন অবশ্যই। মানুষ হিসাবে ওনার কোনো তুলনাই হয় না।'

'আচ্ছা। পরিচয় হলে দেখবখন।'

‘এই, আমি রাখি। আমার হাজবান্ডের ফোন করার কথা। উনি আবার ফোন এনগেজড দেখলে কী না কী ভাববেন।’

‘ও মা! আপনি ফোন এনগেজড করে রাখেন না কখনো? আপনার কোনো বান্ধবী নাই? বন্ধু নাই?’

‘তা আছে।’

‘তারা আপনার ফোন এনগেজড করে রাখে না?’

‘রাখে।’

‘উনি কিছু বলেন?’

‘না, বলেন না।’

‘আপনি সত্যি লাকি। আমি হলে সহ্য করতাম না। সোজা ফোনের লাইন কেটে দিতাম।’

‘যাহ। আপনি বুঝি এই রকম!’

‘কোনো পুরুষই তার নিজের নারীকে শেয়ার করতে চায় না।’

‘শেয়ার করার প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে?’

‘তা অবশ্য ঠিক। এই আমিও রাখি। আমাদের আবার কালকে একটা শুটিং আছে। কয়েকটা ফোন করতে হবে।’

‘আচ্ছা। শোনেন, ফোন দিয়েন কিন্তু।’

‘শোনো, তোমার পরিচিত কোনো ভালো মডেল ফটোগ্রাফার আছে নাকি জানো?’ রেবা চা বানিয়ে সামনে রেখে জিজ্ঞেস করে। নাসিরের বুকটা কেঁপে ওঠে। সে মুখ নির্বিকার রেখে বলে, ‘কেন বলো তো?’

‘আর বোলো না, চৈতীর খুব শখ হয়েছে, সুন্দর করে ছবি তুলবে। বয়স তো বসে থাকছে না। এই বয়সের ভালো ছবি রেখে দেবে। পরে বুড়ি হলে সেসব বের করে দেখবে।’

‘ভালো আইডিয়া।’

‘আছে কেউ পরিচিত?’

‘সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়ে বড় করে অ্যাড তো দেখি। চঞ্চল মাহমুদ। এখানে মডেল ফটোসুন্দরী প্রতিযোগিতার জন্যে ছবি তোলা হয়।’

‘একটু ফোন নাম্বারটা নিয়ে এসে ফোন করে দাও না।’

‘আচ্ছা দেব।’

'কত টাকা নেয়, এইসবও জানতে হবে। তুমি ফোন করে দিও।'

'না না, আমাকে লাগবে না। চৈতীকে দিও। ওই ফোন করবে।'

'আচ্ছা, তাও হয়। এই, আমিও তুলি কতগুলো ছবি?'

'তুলো।'

'বয়স তো আমারও পেরিয়ে যাচ্ছে। এই বলো তো, আমি আসলে দেখতে কেমন?'

'খুব সুন্দর।'

'আমাকে দিয়ে কিসের মডেলিং হবে বলো তো, বাতের রোগীর নাকি মেদভুঁরি কী করব?'

'কী বলো তুমি? তোমাকে দিয়ে তো শ্যাম্পুর অ্যাড করানো উচিত।'

'যাহ! তুমি না সব সময় আমার ব্যাপারে বাড়িয়ে বল।'

'না তো। বাড়িয়ে বলি না তো। কমিয়ে বললাম। এই যেমন তোমার বয়স ষোল।'

'এটা কি কমানো হলো? নাকি বাড়ানো হলো?'

'এই, তুমি এইভাবে কথা বলছ কেন?'

'কীভাবে?'

'যে আমার বয়স ষোল?'

'তোমাকে তাই দেখায়।'

'আমার আসল বয়স জানো।'

'কত?'

'২৮।' রেবা দুই বছর কমিয়ে বলল, শুনে নাসির হাসে!

'যাহ্! হতেই পারে না। তোমাকে না তোমার বাইশ বছর বয়সে বিয়ে করলাম।'

'আমাদের বিয়ের পরে আট বছর পেরিয়ে গেছে।'

'তাহলে? না, তোমাকে বিয়ে করেছি যখন তোমার বয়স ছিল ষোল। তার মানে এখন তোমার চব্বিশ। তবে তোমাকে চব্বিশ দেখায় না। তোমাকে আঠারো-উনিশই লাগে।'

'সত্যি তুমি আমাকে তাই ভাব?'

'হুঁ।'

'আমাকে তোমার ভালো লাগে?'

'খুব।'

‘আমাকে কখনো ছেড়ে যাবে না তো?’

‘না।’

‘তোমাকে যে কোনো বাচ্চা দিতে পারছি না?’

‘সেটা আমার দোষ, তোমার নয়।’

‘হুজুর বলেছেন, এবার হবে।’

‘নিশ্চয়ই।’

‘আসো।’

‘কী?’

‘বাচ্চা হওয়ার চেষ্টা করি।’

‘এখন? এই অসময়ে?’

‘হুঁ। আমার অসময়েই ভালো লাগে।’

‘আসো। যা ঠাণ্ডা। কাপড়চোপড় যত কম খোলা যায়।’

‘না, তাহলে হবে না। আসো কম্বলের নিচে ঢুকে পড়ি। অনেক ভালো করে আদর করবে আমাকে। তাহলে হবে।’

‘আসো।’

কিন্তু নাসির পারে না। আশ্চর্য তো। পারল না কেন সে? এর আগে তো কখনো এই রকম হয়নি। তার এই ব্যাপারে তো কোনো দুর্বলতা ছিল না।

রেবা সাপের মতো চোখ করে তাকে দেখছে। তার দৃষ্টি হিমশীতল।



'আপনার উন্নতি হলো কিছু?'

'না। বরং ডেটোরয়েট করেছে!'

'কী রকম?'

'কালকে আমি আমার ওয়াইফের সঙ্গে...ফার্স্ট টাইম ইন মাই লাইফ... আই ফেইলড টু মেক লাভ উইথ হার।'

'কেন? কোনো কারণে টায়ারড ছিলেন?'

'না, তেমন না।'

'জ্বর থাকলে বা এলার্জি হলেও কিন্তু বডি রেসপন্স করে না।'

'না, শরীর ঠিক ছিল।'

'আচ্ছা আসেন দেখি, আপনার ব্লাড প্রেশারটা মেপে দেখি। শুয়ে পড়েন।' ডাক্তার সাহেব স্টেথো কাঁধে, ব্লাড প্রেসার মাপা যন্ত্র হাতে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ান।

নাসির আলী রোগী দেখা উঁচু টেবিলটার দিকে যায়। শার্টের হাতা গুটিয়ে নিতে থাকে। বেডটা একটু উঁচু। নিচে একটা কাঠের সিঁড়ি আছে। তাতে পা দিয়ে সে বিছানায় উঠে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে।

'বিপি তো দেখছি ঠিকই আছে।' ব্লাড প্রেশার মাপার যন্ত্রটার বাতাসভরা থলেটায় চাপ দিয়ে বাতাস বের করে দিয়ে সেটাকে ভাঁজ করতে করতে ডাক্তার বলেন। 'আসলে জানেন কী, সেক্স জিনিসটা মেন্টাল। বডিতে বডিতে সেক্স হয় না। সেক্স হয় মনে মনে। আপনাকে মেন্টালি অ্যান্ড ইমোশনালি এটাচড হতে হবে।'

'কিন্তু স্যার, যখন সামবডি বায়িস সেক্স, সেক্সটা যখন সে কেনে,

টোটালি আননোন একটা পার্টনারের সঙ্গে যখন বিছানায় যায়, হাউ ডু দে ডু ইট? অর হাউ কাম সামবডি রেইপ্‌স?'

'ভ্যালিড কোশ্চেন। মানুষ আসলে একেকজন একেক রকম। আর মানুষের মনটাও বিচিত্র। আপনি নিজের ওয়াইফের সঙ্গে ইজাকুলেট করতে পারছেন না, বাট ইউ গো টু সাম স্ট্রেঞ্জার, ইউ মে ইজেকুলেট বিফোর ইউ পেনিট্রেট।'

'আই জাস্ট ক্যাননট ডু দ্যাট।'

'ইউ আর অ্যান অনেস্ট পারসন। বাট, আপনার জীবনের গল্পগুলো আপনি কিন্তু আমাকে বলছেন না। কাজেই আপনার কিন্তু ইম্প্রুভ রেট খুব স্লো।'

'বলব স্যার। আপনি কোশ্চেন করেন। আমি জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব।'

'আর ইউ হ্যাপি ইন ইয়োর কনজুগাল লাইফ?'

'ভেবে দেখিনি।'

'আপনার ওয়াইফকে কি আপনি সন্দেহ করেন কোনো কারণে? তার কি কোনো এক্সট্রা-ম্যারিটাল এফেয়ার আছে?'

'ফোনে কথা বলে। বাট আই এম নট শিয়োর হাউ ফার দে হ্যাভ গান!'

'আপনি নিজে কি কোনো রিলেশনে ইনভলভড?'

'না।'

'সত্য কথা বলুন। আপনার চোখের পাতা কাঁপছে। আপনি কোনো কিছু লুকাচ্ছেন।'

'না, লুকাচ্ছি না। নাসির আলীর কোনো সমস্যা নাই। বাট, হামিদ আলী হ্যাজ গট সাম রিলেশনশিপ উইথ অ্যান আননোন লেডি। লিজি। ফোন করে। ফোনে কথা হয়। এডাল্ট মার্কা কথাও হয়। দ্যাটস অল।'

'হুঁ। আপনার মধ্যে ডুয়েল পারসোনালিটি এরাইজ করেছে। মাল্টিপল পারসোনালিটি ডিজঅর্ডার। এইটা যে খুব রেয়ার ডিজিজ, তা নয়। ইটস কিউরেব্‌ল। নিয়মিত ওষুধ খেতে হবে। আপনার ওয়াইফের সহযোগিতা লাগবে। ওনাকে একদিন আনতে পারবেন?'

'ও তো জানে না আমি আপনার কাছে আসি..।'

'ওনাকে বলেন। একদিন নিয়ে আসেন। আর আপনি আপনার শৈশবের কথা বলেন। ছেলেবেলায় আপনি কোনো রকম ট্রমার মধ্যে ছিলেন?'

'জি?'

'ধরেন, কোনো অকারেন্স? লাইক চাইল্ড অ্যাবিউজ?

'না।'

'আপনাকে কি আপনার বাবা-মা কেউ খুব মারধর করত?'

'না।'

'আপনার বাবা-মার কি ডিভোর্স হয়েছিল?'

'না।'

'আপনার বাবা-মার সম্পর্ক কেমন ছিল?'

'ভালো।'

'আপনার ছোটবেলায় আপনাকে কেউ রেইপ করেছে?'

'না।'

'মাল্টিপল পারসোনালিটি ডিজঅর্ডারের সঙ্গে সাধারণত ছোটবেলার সম্পর্ক থাকে। আমার মনে হচ্ছে আপনি কিছু লুকাচ্ছেন।'

'না স্যার। আমার ছোটবেলা ছিল খুব সুন্দর। আমাদের এক জোড়া রাজহাঁস ছিল। আমি সেই হাঁসের পেছনে ছুটতাম...হাঁসদুটো মাঝে-মধ্যে বাড়ি ফিরত না। আমি তই তই করে ডাকতাম। আর তখন হাঁসের খোঁজে চলে যেতাম অনেক দূর। অনেক দূর। মা তখন আমাকে ডাকত, হামিদ হামিদ..।'

'আপনার নাম তো নাসির। আপনি হামিদ ভাবছেন নিজেকে। আপনি নাসির হোন। আপনি বলেন ছোটবেলায় আপনার জীবনে কী অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল?'

'স্যার, চারদিক নীল হয়ে আসছে।'

'মানে কী?'

'মা যেদিন মারা গেলেন, সেদিন সবকিছু নীল হয়ে গিয়েছিল। সব কিছু..।'

'আপনার মা কবে মারা যান?'

'অনেক আগে..।'

'আপনার বয়স তখন কত?'

'আট বছর।'

'আপনার মা মারা গেলেন কী করে?'

'ভুল করে বিষ খেয়েছিলেন।'

'পরে আপনার বাবা আবার বিয়ে করেন? সেই মা কি খুব অত্যাচার করত?'

'না স্যার।'

'আপনার মা কি সুইসাইড করেছিলেন?'

'আমি ঠিক বলতে পারব না স্যার।'

'আপনার বাবা কি তাকে বিষ দিয়ে মেরেছিলেন?'

'সেই রকম কেউ কিছু বলেনি। তবে..।'

'তবে?' ডাক্তার খুব বন্ধুসুলভ গলায় বলে।

'আমার শৈশব খুব সুন্দর ছিল। আমি বাগান করেছিলাম। তাতে ফুলগাছ লাগিয়েছিলাম। বিস্কুট ফুল ফুটত। আপনি বিস্কুট ফুল চেনেন?'

'কে বাগান করেছিল? হামিদ আলী নাকি নাসির আলী?'

'হামিদ আলী।'

'নাসির আলীর জীবনে কী ঘটল? তার মা কেন বিষ খেল?'

'জানি না স্যার। পরিতোষ কাকুর জন্যে হতে পারে।'

'পরিতোষ কাকু কে?'

'আমাকে অঙ্ক পড়াতে আসতেন।'

'মার সঙ্গে তিনি কি খুব মিশতেন?'

'তারা যখন একসাথে থাকতেন মা খালি হাসতেন। উনি খুব রসিক ছিলেন..।'

'হুম। গট ইট। আপনাকে ওষুধ দিচ্ছি। আপনি সেরে উঠবেন।'

'কী সেরে উঠব?'

'আপনি আর হামিদ থাকবেন না। আপনি নাসির হয়ে যাবেন।'

'আমি কি হামিদ হয়ে যেতে পারি?'

ডাক্তার সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'আমার এত দীর্ঘ ডাক্তারি জীবনে আপনার মতো পেশেন্ট এর আগে পাইনি। আপনি খুব একটা স্পেশাল কেস। আপনি কিন্তু রেগুলার আসবেন। আজ থেকে পনের দিন পরে আবার আসবেন।'

'আচ্ছা আসব।' খুব বাধ্য গলায় বলে নাসির। আসলেই সে আবার আসতে চায়। ডাক্তার সাহেবকে তার পছন্দ হয়েছে। বেশ টম আর জেরির

খেলা শুরু হয়েছে যা হোক। ডাক্তার সাহেব টম, আর তার রোগটা হচ্ছে জেরি, ধরা যাচ্ছে, কিন্তু যাচ্ছে না। আসলে তো এই খেলায় কোনোদিন জেরি ধরা পড়বে না, কারণ ধরা পড়লেই খেলা শেষ। নাসির ডাক্তার সাহেবের চেম্বার থেকে বেরুনোর সময় জুতার মধ্যে পা গলাতে গলাতে ভাবে।



আজকে অফিসে একটা কাণ্ড ঘটেছে। হামিদ আলীর নামে একটা পারসেল এসেছে। মামুন প্যাকেটটা নিয়ে হাসতে থাকে। 'হামিদ আলী, এইটা আবার কে?'

'আমার নামই বোধ হয় কেউ ভুল করে হামিদ আলী লিখেছে।' নাসির পারসেলটা খোলে। ভেতরে একটা সুন্দর জলরঙের ছবি। কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা। কে পাঠাল এটা? নাসির ভেবে তল পায় না। রেবা পাঠাতে পারে। লিজি পারে। আর কেউও হয়তো পারে। কিন্তু ছবিটা তার ভারি পছন্দ হয়েছে। অরিজিনাল কাইয়ুম চৌধুরী মনে হচ্ছে।

রেবা বোধ হয় পাঠায়নি। ও কাইয়ুম চৌধুরীর ছবির মর্ম ও মর্যাদা বোঝার মতো মেয়ে না। লিজি পাঠাতে পারে? লিজির সঙ্গেও তো ওর এইসব নিয়ে কখনও কথা হয়নি। ব্যাপারটা নিয়ে ধন্ধ কাটে না।

লায়লার সঙ্গে হামিদ আলী টেলিফোনে চালিয়ে যাচ্ছে। লায়লা ছবি তুলেছে চঞ্চল মাহমুদের ওখানে। ছবিগুলো নিয়ে সে চলে আসতে চায়। হামিদ আলী তাকে বলেছে ডাকে পাঠাতে। একটা ঠিকানা তাকে দেওয়া দরকার। এই অফিসের ঠিকানা দিলে সে ধরে ফেলতে পারে। অন্য অফিসের ঠিকানা দেবে, নাকি সত্যিকারের কোনো অ্যাডভার্টাইজিং ফার্মের ঠিকানা দেবে সে? ওপরে লেখা থাকবে হামিদ আলী, তার নিচে যে কোনো একটা অ্যাড এজেন্সির ঠিকানা, ডাকে ফেললেই চলে যাবে, আর চলে গেলে, ফোনে কথা বলতে অসুবিধা হবে না। কারণ ছবিগুলো কেমন, সেটা তো সে আগে থেকেই জানে। না, মডেলিঙের বিনিময়ে কোনো কিছু চাওয়ার ইনডিসেন্ট প্রোপোজাল হামিদ আলী করেনি লায়লাকে। এটা বোধ হয় তার পক্ষে জীবনেও করা সম্ভব না।

অফিস থেকে হামিদ আলীর নাম-ঠিকানা লেখা খামে করেই জলরঙের ছবিটা নিয়ে বের হয় নাসির।

পিংক লাইন বাস থেকে নেমে পাড়ার ভিডিও দোকানে একবার উঁকি দেয় সে।

লম্বা চুলের লোকটা যথারীতি ভিসিআরে হিন্দি ছবি দেখছে।

'সিডি দেখান না দুটো। নতুন কী এসেছে?' নাসির আলী বলে।

'নাসির না হামিদ?' লোকটা আগের মতোই টিভিপর্দা থেকে চোখ না তুলে বলে।

'হামিদ।'

'আসছে। দিব?'

'দেন।'

দোকানি দুটো সিডি গোপনে প্যাকেটে ভরে দেয়। অতি সতর্কতার কারণ এইবারের সিডি হচ্ছে হামিদ আলী মার্কা। দোকানি জানে, কোনো লোক যখন নিজের নাম গোপন করে সিডি নেয়, তখন নেয় নিষিদ্ধ ছবি, প্রাপ্তবয়স্কদের ছবি। নাসির ৪০ টাকা দেয় তার হাতে।

সিডি দুটো নিয়ে নাসির হেঁটে হেঁটে বাসায় আসে। দোরঘণ্টি বাজায়। দরজা খুলে দেয় রেবা। কোনো কথা হয় না। তারা ভেতরে যায়।

নাসির প্যাকেটগুলো একটা টেবিলে রাখে। তারপর বাথরুমে যায়। রেবা এসে খামগুলো চেক করতে শুরু করে। দেখতে পায় হামিদ আলী লেখা খাম। সে চমকে ওঠে? শীতের এই সন্ধ্যাতেও সে ঘামতে থাকে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। তার মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠলে সে ধপ করে বসে পড়ে বিছানায়। হামিদ আলী লেখা খাম নাসিরের কাছে কোত্থেকে এল! সে কিছুই বুঝতে পারছে না। কিছুই না।

বাথরুমের দরজায় শব্দ হতেই তাড়াতাড়ি রেবা খামগুলো যথাস্থানে রেখে দেয়, যাতে নাসির কিছু বুঝতে না পারে।

নাসির তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে এই ঘরে আসে। তারপর তোয়ালেটা বারান্দায় তারে ঝোলাতে যায়।

ফিরে এলে রেবা তাকে জিজ্ঞেস করে, 'এই খামটা কার?'

নাসিরও চমকে ওঠে। সে একটা বড়ো ভুল করে ফেলেছে। হামিদ

আলী লেখা খাম তো তার এই বাসায় আনা উচিত হয়নি। সেও ঘামতে থাকে। মিনমিনে গলায় বলে, 'হামিদের।'

রেবা বলে, 'উনি কে?'

'হামিদ আলী। তুমি চিনবে না।'

'তুমি কি শিয়োর আমি চিনব না?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি তোমার শিয়োরিটি নিয়ে বসে থাকো।'

'তার মানে তুমি চিন হামিদ আলীকে?'

রেবা চুপ করে থাকে।

'বলো হামিদ আলী কে? তার সাথে কোথায় কীভাবে তোমার পরিচয়?'

রেবা বলে, 'আমি কি বলেছি যে আমার সাথে তার পরিচয় আছে?'

'তোমার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে যে আছে। বলো। আমাকে কোনোকিছু লুকিও না।'

'আমি কোনোকিছু লুকাচ্ছি না।'

তারপর বেশ খানিকক্ষণের নীরবতা।

এক সময় মৌনভঙ্গ করে নাসির বলে, 'একটু কি চা পেতে পারি?'

রেবা ওঠার সুযোগ পায়। গলা উঁচিয়ে বলতে থাকে, 'জয়তুন জয়তুন! চা দে।'



রেবা বুঝতে পারে, সে একটা ভুল করে ফেলেছে। নাসিরের সামনে তার বলা উচিত হয় নাই যে সে হামিদ আলীকে চিনতেও পারে। এই গাধামোটা কেন যে করতে গেল। এখন পস্তাতে হবে।

তবে হামিদ আলীকে তো সেইভাবে চেনেও না সে। লোকটা তাকে ফোন করে তার ফটো পাঠাতে বলেছিল। রেবা তুলি তুলি করেও শেষ পর্যন্ত ছবি তোলেনি। তার মনে ভয়, আশঙ্কা, যে, ছবি দেখলে হামিদ আলী হয়তো তাকে আর পছন্দ করবে না। কিন্তু সে জানে, সামনাসামনি এলে, হামিদ আলী তাকে অপছন্দও করতে পারবে না। কারণ রক্তমাংসের নারীর একটা জাদুকরী সম্মোহনী শক্তি আছে। অন্তত তার আছে। রেবা সেটা অন্তত এক যুগ থেকে বুঝে আসছে। সে পুরুষদের আকর্ষণ করতে পারে। এইটা তার জীবনের একটা খেলা। প্রতি বছর শেষে সে গুনতে বসত, এ বছর কতগুলো ছেলে তাকে প্রোপোজ করেছে।

অসময়ে বিয়ে হয়ে যাওয়াতে সেই খেলায় একটা সাময়িক ছেদ পড়েছে বটে, কিন্তু তাতে তার ক্রীড়া-প্রতিভা নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। এখনও সে সমানভাবে ছেলেদের আকৃষ্ট করতে পারে।

কিন্তু সেটা সে পারে তার ব্যক্তিত্ব দিয়ে। তার ছবিই কাউকে জালে আটকাতে পারবে কি না, সে নিশ্চিত নয়। তাই সে শেষতক ছবি পাঠানোর চিন্তা বাদ দিয়েছে। তবে, সে জানে, একদিন না একদিন সুযোগ আসবে, যেদিন সে হামিদ আলীর মুখোমুখি হতে পারবে এবং তার শেষ ফল হবে, হামিদ আলী তার আকর্ষণের জালে লটকে থাকবে।

কিন্তু কে এই হামিদ আলী? নাসিরের কাছে তার নাম লেখা খাম কোত্থেকে এল? তারা কি দুজন দুজনকে ভালোভাবে চেনে?

রেবা বুঝতে পারে না তার কী করা উচিত। প্রতীক্ষা করো এবং দ্যাখো–এই নীতি অবলম্বন করাকেই সে শ্রেয়তর বলে সিদ্ধান্ত নেয়।



নাসির রাত ৮টা না বাজতেই শুয়ে পড়ে। দুটো নতুন সিডি এনেছে সে, হামিদ আলী মার্কা সিডি, কম্পিউটারে বসে চুপি চুপি সিডি দুটো পরখ করে নেওয়া যায়, কিন্তু সে কোনো রকমের উৎসাহ বোধ করে না। বরং এইভাবে অসময়ে গেস্টরুমের বিছানায় শুয়ে থাকতে তার ভালো লাগে।

ঘর অন্ধকার। জানালা দিয়ে বারান্দার আলো আসছে পর্দা ঠেলে।

শুয়ে শুয়ে থাকতে থাকতেই তার মনে হয়, সে এখানে শুয়ে আছে কেন? এটা কোন জায়গা? এটা তো তার বাড়ি নয়। এখানে তো সে জন্মগ্রহণ করেনি। এখানে তো তার রক্তসম্পর্কিত কোনো আত্মীয়-স্বজন নাই। এইটা তো তার ঘর নয়। এই বাড়ি থেকে তো সে স্কুলে যায়নি।

সে এই অনাত্মীয় প্রতিবেশের ভেতরে স্থাপিত হলো কী করে?

তার মানে কি সে নাসির নয়? কই, তার মা তো তাকে ডাকছে না নাসির নাসির বলে। তাহলে কে সে? সে তো নাসির আলী নয়। সে হামিদ আলী। আর ওই যে পাশের ঘরে একজন ভদ্রমহিলা টেলিভিশনে হিন্দি সিরিয়াল দেখছেন, তিনিও তার কেউ নন। তিনি লায়লা।

রেবা আসে।

'অসময়ে শুয়ে পড়লে যে?' রেবা জিজ্ঞেস করে।

'খুব মাথা ধরেছে।' সে উত্তর দেয়।

'কী সব ওষুধপত্র খাচ্ছ? তোমার সমস্যাটা কী? কিছু তো বলোও না।'

'কী বলব?'

'কোনো হেল্প লাগবে?'

'মাথাটা একটু টিপে দেবে?'

'আমারটাই বা কে টিপে দেয়। আমার যে শরীরটা খারাপ একটু খেয়াল করেছ?'

‘তোমার শরীর খারাপ নাকি? না তো। আমি তো কিছু জানি না।’

‘তা আর জানবা কেন? আমার দিকে তোমার কোনো খেয়াল আছে?’

‘নাই বলছ?’

‘না নাই।’

‘আছে। তোমার দিকে আমার অনেক খেয়াল আছে। তুমি আজকাল আমার দিকে আর খেয়াল কর না। আমাকে সময় দাও না। আমার কথা ভাব না। ইউ আর বিজি উইথ সামথিং এল্‌স। এই কারণে আমার দিকে তোমার কোনো অ্যাটেনশন নাই।’

‘কী বলছ তুমি এসব? আমি আবার কী নিয়ে বিজি থাকব?’

‘সেইটা আমি কী করে বলব? তুমি আমার চেয়ে অনেক ভালো জান।’

‘বানিয়ে বানিয়ে কথা বোলো না তো!’

‘বানিয়ে বানিয়ে বলছি না। আজকাল তুমি সারাদিন ফোনে কার কার সঙ্গে যেন কথা বল। আমি অফিস থেকে ফোন করে করে তোমাকে পাই না। ফোন সারাক্ষণই ব্যস্ত পাই। কার সঙ্গে তুমি কথা বল?

‘না তো, কার সঙ্গে আবার? চৈতীর সঙ্গে। মাঝে-মধ্যে বড়পা ফোন করে নিউইয়র্ক থেকে। বগুড়া থেকে করে লিনু। এই তো।’

‘শোনো। আমাকে বোকা ভেবো না। আমাদের ফোনটা কলার আইডি। সব নাম্বার উঠে থাকে।’

রেবা হঠাৎ করে রেগে যায়। সে চিৎকার করে বলে ওঠে, ‘তুমি এত নিচ! তুমি এত ছোটলোক! আমাকে তুমি এই রকমভাবে সন্দেহ কর! আমি তোমার ঘর করব না।’

‘যাও। যাও।’

নাসির চোখ বন্ধ করে থাকে। রেবা ফুঁসতে ফুঁসতে উঠে পাশের ঘরে যায়। টেলিভিশন ছেড়ে দেয়। টেলিভিশনে কাহানি ঘর ঘর কি জাতীয় একটা কিছুর মিউজিক বেজে ওঠে।



গভীর রাতে নাসিরের ঘুম ভেঙে যায়। সে প্রথমে বুঝতে পারে না সে কোথায়। সে উঠে বিছানায় বসে। মাথার ওপরে কম্বল তুলে দিয়ে তাঁবু বানানো খেলা খেলে। তারপর সে ধীরে ধীরে নিজেদের শোবার ঘরে যায়।

তাদের শয়নকক্ষটি পুরো অন্ধকার। অভ্যাসমতো সে মশারি ঠেলে বিছানায় ঢুকে পড়ে।

রেবাও কম্বলের নিচে। তার নাক ডাকার শব্দ আসছে। রেবা তার দিকে পিঠ দিয়ে শোওয়া। সে আস্তে আস্তে রেবাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে। তার ঘাড়ে চুমু দিতে থাকে। শরীরের নিচ দিয়ে এক হাত ঢুকিয়ে দিয়ে আরেক হাত ওপর দিয়ে নিয়ে সে তাকে সাপের মতো করে জড়ায়। তার দুহাতের মধ্যে রেবার বুকদুটো। সে চুমু দিতে দিতে ডাকে, 'লায়লা লায়লা..!'

ঘুমের মধ্যেই রেবা জবাব দেয়, 'হামিদ আলী হামিদ আলী..!'

'হ্যাঁ গো আমি তোমার হামিদ আলী। লায়লা সোনা। নড়ো না। আমি তোমাকে আদর করব।'

রেবা আরাম পাওয়ার মতো শব্দ করে শরীর মেলে ধরে।

হামিদ আলী লায়লার সমস্ত শরীরে চুমু দেয় আর তাকে লায়লা লায়লা বলে ডাকে।

লায়লা জেগে উঠে হামিদ আলীকে উপুর করে শোওয়ায়। আর নিজে তার পিঠে শুয়ে তার ঘাড় কামড়াতে থাকে। 'হামিদ, আমার হামিদ..।'

হামিদকে সে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে গভীরভাবে ভালোবাসতে থাকে।

লায়লা যেন বুনো সহিস, আর হামিদ এক আদিম অশ্ব, তারা খুরের আঘাতে ধরিত্রীকে ক্ষত-বিক্ষত করে তুলবে। লায়লা চাবুক হানে। হামিদ ছুটে চলে।

'হামিদ..হামিদ..!'

'লায়লা লায়লা..!'

'হামিদ..!'

'লায়লা..!'

'হামি...'

'লালু..'

'হা..'

'লা...

হাআ আ আ..!'

লায়লা এলিয়ে পড়লে এবার হামিদের পালা। এবার অশ্বারোহীর ভূমিকা নেয় সে। 'লা..লা..লা..'

তারপর ক্লান্ত শ্রান্ত ধ্বস্ত তৃপ্ত দুজনেই সেঁধিয়ে পড়ে নিদ্রাভল্লুকের পেটের ভেতরে।

সকালবেলা, আলো এসে নির্লজ্জের মতো তাদের ভেঙচি কাটতে থাকে।

রেবার ঘুম ভেঙে গেলে সে দেখে যে নাসির তার পাশে শুয়ে।

সে তার রাত্রিবাস খুঁজে ফেরে বিছানাময়।

নাসিরেরও ঘুম ভেঙে যায়। রেবাকে নগ্ন দেখে সে বুঝতে পারে না এখানে সে কীভাবে এলো। সে না রাতের বেলা অতিথি-কক্ষে শুয়েছিল!



রেবা জানায়, 'নাসির, সম্ভবত সুখবর আছে। আমার তো এইমাসে শরীর খারাপ হয়নি।'

নাসির চুপ করে থাকে। মেয়েদের শরীর। কত কারণে খারাপ হয়। কত কারণে হয় না। সে খুব ভালো করেই জানে, বাবা হওয়ার ক্ষমতা তার নাই। রেবা যা ভাবছে, তা মিথ্যা একটা কুহক ছাড়া আর কিছুই নয়।

আরো কয়েকদিন পর রেবা বলে, 'ওষুধের দোকানে দেখি, প্রেগনান্সি টেস্ট করার কিট পাওয়া যায়। একটা কিনে এনো তো।'

নাসির তার কথা কানেও তোলে না।

শেষে রেবা নিজেই সেই কিট কিনে আনে এবং নিজের পেশাব নিজেই পরীক্ষা করে।

রেজাল্ট পজিটিভ। সে দৌড়ে যায় নাসিরের কাছে। 'নাসির, এই দেখো, রেজাল্ট পজিটিভ। তার মানে আমার পেটে আমাদের সন্তান। বলেছিলাম না, পীর বাবার পড়া শরবত খাস নিয়তে খেলে ফল পাওয়া যাবেই?'

নাসির শুকনো মুখে বলে, 'তাই তো দেখছি।'

'তুমি খুশি হওনি?'

'কী বলো? খুশি হব না কেন? নিশ্চয়ই অনেক খুশি হয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ।'

'এই, চলো। ডাক্তারের কাছে যাই। ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখুক। তার আগে কাউকে কিছু বলার দরকার নাই।'

'ঠিকই।'

'কবে যাব ডাক্তারের কাছে? চলো আজকেই যাই।'

'আজকে? আজকে কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া যাবে। কালকে যাই?'

'আচ্ছা কালকে। কোন ডাক্তার দেখাব আমরা, বলো তো!'

'তুমি বলো।'

'গাইনির ডাক্তার তো অনেকেই আমার চেনা। কতজনের কাছে গেছি একটা বাচ্চার জন্য।'

'সে তো গেছিই।'

'কিন্তু আজকে তো কেস আলাদা। পেটে সত্যি সত্যি বাচ্চা আছে কিনা টেস্ট করবে আর যদি আল্লার রহমতে হুজুরের দোয়ায় বাচ্চা এসে থাকে, তাহলে তার যত্ন, আমার যত্ন, আমাকে কী কী করতে হবে না হবে, সেইসব দেখবে এবার ডাক্তার। কাকে দেখাই বলো তো?'

'তুমিই খোঁজ নিয়ে দেখো। আমি তো আর এইসব জানি টানি না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে চৈতীকে জিজ্ঞেস করে দেখব। ওর কাছে সব ইনফরমেশন থাকে। নিজেই তো ও তিনটার মা। থাকবেই তো। তাই না?'

'তা থাকবে।'

'কিন্তু তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি খুশি হও নাই!'

'আরে কী বলে! খুশি হবো না কেন? খুব খুশি হয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ।'



নাসির মুখে বলল বটে যে সে খুশি হয়েছে, আসলে তার মনটা খুবই বিক্ষিপ্ত। সে সারারাত ঘুমাতে পারে না। এটা কি হতে পারে? যদি সত্য সত্য রেবার পেটে বাচ্চা এসে থাকে, তাহলে সেটা বড়জোর হামিদ আলীর বাচ্চা, আর সেটা রেবার পেটেও আসেনি, এসেছে লায়লার পেটে। এইটা কি সম্ভব?

সারারাত সে এলোমেলো স্বপ্ন দেখে, মানুষ আর ঘরবাড়ি আর গাছপালা আর গরুছাগল সব পৃথিবীর গায়ে ঝুলে ঝুলে আছে। তাদের পা আসলে ওপরের দিকে, মাটির দিকে, আর মাথা নিচের দিকে, শূন্যের দিকে। কোনো কারণে যদি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ক্ষমতা খানিকটা কমে যায়, তারা সবাই শূন্যে নিক্ষিপ্ত হবে।

মানুষ সবাই আসলে ঝুলে আছে পৃথিবীর সঙ্গে।

কী ভয়াবহ ব্যাপার!

মানুষ কেন গাছ হলো না? গাছ হলে তো শেকড় দিয়ে মাটি আকড়ে ধরে রাখা যেত! মানুষের পায়ের সঙ্গে ভূ-গোলকের তো কোনোই সংযুক্তি নাই। কী হবে এখন?



পরের দিন অফিসে গিয়ে মামুনের ফোন থেকে সে কল করে তাদের বাড়ির নম্বরে। রিং হয়। কিন্তু রেবা তথা লায়লা ফোন ধরে না।

সে অনেকবার চেষ্টা করে। তবুও লায়লা/রেবা ফোন তোলে না। ব্যাপার কী?

লিজির ফোনও এসেছিল। আমি এখন খুব ব্যস্ত বলে নাসির লাইন কেটে দেয়।

তারপর আবার ফোন বেজে ওঠে। ক্রিং ক্রিং ক্রিং। এই ফোনটার রিংগারটা এতো চড়া। সে ফোনের রিসিভার তুলে রাখে টেবিলের ওপরে।

রিসিভারের সঙ্গে যুক্ত তারটা বেশি পেঁচিয়ে গেছে। এই প্যাঁচ খুলতে হবে। রিসিভারটা হাতে ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে তারের প্যাঁচ খোলে।

কিন্তু তার মনে হয়, সে যতই প্যাঁচ খুলছে, ততই বেশি করে যেন ফোনসেটটা পেঁচিয়ে যাচ্ছে।



সন্ধ্যার পর তারা যায় ডাক্তারের কাছে। নাসির ডাক্তারের রুমের বাইরে সারি সারি চেয়ারের একটায় বসে থাকে। রেবা ভেতরে ঢোকে। নাসিরের তখনই নিজেকে দায়িত্ববান পুরুষ তথা হামিদ আলী বলে মনে হয়।

ভেতরে মহিলা ডাক্তার রেবার কাছ থেকে বিবরণ শুনে তার পেশাবের স্যাম্পল দিতে বলেন এবং তাকে নিজের হাত দিয়ে পরখ করেও দেখেন।

নাসির আলী ওয়েটিং রুমে বসে থাকতে থাকতে নিজেকে একটা দূর পাল্লার বাসের যাত্রী বলে ঠাওরায়। সে একটা পুরোনো পত্রিকা হাতে তুলে নেয়। পত্রিকার পাতায় ছাপা হওয়া একটা নায়িকার ছবি দেখে ভদ্রমহিলা কী শ্যাম্পু চুলে মাখেন তা জানার কৌতূহল বোধ করে।

পেশাব পরীক্ষার পর রেজাল্ট পজিটিভ বলে তিনি রায় দেন। ভেতরে নাসির আলীকেও ডাকা হয়।

ডাক্তার, দুটো দাঁত বড়, রং ময়লা, মধ্যবয়স, নাসিরকে অভিনন্দন জানান। ডাক্তার মহিলাটি সম্ভবত পান খান, তার মুখ থেকে পানের গন্ধ ভেসে আসে।

এখন থেকে রেবাকে কী কী করতে হবে, কী কী করতে হবে না, তার একটা বিস্তারিত তালিকা ডাক্তারনি পেশ করেন। কতদিন পর পর এসে চেক করাতে হবে, কী কী কাজ করা যাবে, করা যাবে না, সবই ওই তালিকায় আছে।

নাসিরের নিজেকে ভারি ক্লান্ত বলে মনে হয়।

বাসার কাছেই ডাক্তারখানা। তবু তারা রিকশায় ফেরে না, ট্যাক্সি ডাকে। এত কাছে ট্যাক্সি যেতে না চাওয়ায় নাসির তাকে নগদ একশ টাকা দেবার প্রস্তাব দেয়। ট্যাক্সিওয়ালা তাদেরকে দুই মিনিটে বাসায় পৌঁছে দিয়ে ধন্য করেন।

বাসায় এসে রেবা বলে, 'এই, তুমি খুশি হওনি?'

নাসির বলে, 'কিছু জিজ্ঞেস করলা?'

'তুমি খুশি হওনি?' রেবা আবার বলে।

'হ্যাঁ, হয়েছি।' নাসির অনেকটা নির্লিপ্ত মুখে বলে।

রেবার উৎসাহে তা ভাটার সৃষ্টি করে না, সে বলে, 'চলো, একদিন মাজার শরিফে যাই। হুজুরের সঙ্গে দুজন দেখা করে আসি। কেমন?'

'আচ্ছা।'

'তোমার মা বেঁচে থাকলে ভালো হতো। এখন তাকে আমাদের বাসায় এনে রাখা যেত। আমার আম্মাকে আনা যায়। কিন্তু উনি তো নিউইয়র্কার হয়ে গেছেন। এইসব সময়ে মুরুব্বি একজন লাগে, কী বলো?'

'হ্যাঁ লাগে।'

মা কেন বেঁচে রইল না? তার পুত্রবধূ সন্তানসম্ভবা। এই সময় তার কি বেঁচে থাকা উচিত ছিল না? মা কেন এই রকম একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ করতে গেলেন? নাসির ভাবে। কিন্তু ভেবে ভেবে সে কোনো কূলকিনারা করতে পারে না।



নাসির ঘুমিয়ে পড়েছে।

মশারি টাঙিয়ে দেয় রেবা। একা একা বিড়বিড় করে, এখন কোথায় আমাকে একটু সেবাযত্ন করবে, আমাকে মশারি টাঙিয়ে দেবে, তাতো না, উল্টা আমাকেই তার সেবাযত্ন করতে হচ্ছে।

হামিদ আলী ঘুমাচ্ছে ঘুমাক। নাসির আলী, তুমি ওঠো।

সত্যি সত্যি হামিদ আলীকে শুইয়ে রেখে নাসির আলী উঠে পড়ে। বিছানা ছাড়ে। বাইরে যাওয়ার পোশাক-আশাক পরে। জুতার মধ্যে পা গলায়। আর বেরিয়ে পড়ে। দোতালা বাসা থেকে নামে সিঁড়ি বেয়ে, সিঁড়িতলার ছাদে ষাট পাওয়ারের ফিলিপস বাতির নিচে অনেকগুলো পোকা তার চলে যাওয়া প্রত্যক্ষ করে।

এর মধ্যে নাসির আলী দুই দুইটা ফার্টিলিটি ক্লিনিকে গিয়েছে। নিজেকে পরীক্ষা করিয়েছে। ডাক্তাররা বলেছেন, 'না, কাউন্ট খুব কম আসে। সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্টও না। একদম যে হতে পারে না, এটা বলতে পারব না, কিন্তু আমরা মনে করি না যে এই দেশের চিকিৎসায় আমরা আপনাকে পিতার গৌরব দান করতে পারব। আপনি সিংগাপুরে গিয়ে দেখতে পারেন। ওখানে নতুন একটা পদ্ধতি এসেছে।'

নাসির আলীর মুখ অন্ধকার হয়ে গেছে।

গভীর অন্ধকার।

সেই গভীর অন্ধকার মুখ নিয়ে নাসির আলী বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। গভীর রাত। সে হাঁটতে হাঁটতে হোটেল সোনারগাঁওর পেছনের বস্তির দিকে যায়। গানবাজনার শব্দে সে সচকিত হয়।

আকাশে এক টুকরা চাঁদ। আর কুয়াশা। সে বাজনার উৎস সন্ধান করতে করতে এগোয়।

নাকে বস্তির দুর্গন্ধ। সেই গন্ধের সঙ্গে এসে মেশে কেরোসিনের গন্ধ। কেরোসিনের গন্ধে আত্মহারা হয়ে সে একবার ভুলক্রমে মা বলে ডেকে ওঠে। পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জা পায়।

একটা ছাউনি ঘরের ভেতরে কতিপয় জটাধারী নারীপুরুষ গঞ্জিকায় টান দিচ্ছে আর মন্দিরা বাজিয়ে নাচগান করছে। ছাউনির ওপরে, চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় সে দেখতে পায় লাউগাছ, লতায় পাতায়, ফুলে বেশ ডাঙর হয়ে আছে। একটা লাউও সে দেখতে পায় চালে। লাউ দিয়ে কি এরা ডুগডুগি বানাবে!

মাথা নিচু করে ছাউনির দুয়ারের পাশে একটা বাঁশের খুঁটি ধরে দাঁড়ায়।

কী গান হচ্ছে! কী গান!

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতাম তাহার পায়॥

আট-কুঠুরি নয়-দরজা আঁটা
মধ্যে মধ্যে ঝলকা-কাটা
তার উপর আছে সদর কোঠা—
আয়নামহল তায়॥

মন, তুই রইলি খাঁচার আশে,
খাঁচা যে তোর তৈরী কাঁচা বাঁশে
কোনদিন খাঁচা পড়বে খসে,
লালন কয় খাঁচা খুলে
সে পাখি কোনখানে পালায়॥

পুরো আস্তানা গাঁজার ধোঁয়ায় সাদা হয়ে আছে। নাসির আলী ঘরের দরজায় উঁকি দিলে একজন ফকিরনী তার হাত ধরে তাকে ভেতরে টেনে নিয়ে যায়। সে তাদের পাশে বসে পড়ে। তাকে একটা গাঁজার কলকে

ধরিয়ে দেয়। সে নকল টান দেয়। তাদের সাথে গানে গলা মেলায়।

কলকেতে সে নকল টান দিলেও ওই ঘর ভর্তি ছিল গাঁজার ধোঁয়ায়। সে যখন বস্তিঘরটা ছেড়ে বেরিয়ে আসে, তখন তার পা খানিকটা টলছে।

সে হাঁটে, আর গান গাইতে থাকে বেসুরো গলায়, 'কপালের ফের নইলে কী আর, পাখিটার এমন ব্যবহার..'

রাত্রির নিস্তব্ধ পথে একটা রিকশা এগিয়ে আসে। টুংটাং করতে করতে।

'এই রিকশা, দাঁড়াও' বলে সে হাঁক ছাড়ে।

'আপনে মাতাল না তো? আমি মাতাল লোক আমার রিশকায় তুলি না।'

'যা বেটা। আমি জীবনেও মদ মুখে ধরিনি। আমার বাবা ছোঁয়নি। আমার দাদা ছোঁয়নি। আমার পূর্বপুরুষ ১৪ গোষ্ঠী, কোনোদিন ড্রিংক করেনি।'

'তাইলে ওঠেন। কই যাইবেন?

'ধানমণ্ডি।'

রিকশায় উঠে পড়ে নাসির। রিকশা চলতে শুরু করে। সে রিকশার হুড শক্ত করে ধরে থাকে। কাওরানবাজার এলাকাটা রাতের বেলাতেও জমজমাট। তরিতরকারিভর্তি ট্রাক এসে জায়টাকে গুলজার করে রেখেছে।

পান্থপথ ধরে সে ধানমণ্ডির দিকে এগুতে থাকে।

গ্রীন রোডের মোড়ে পুলিশি চেকপোস্ট। পুলিশ তাদের আটকায়।

তীব্রকণ্ঠে একজন নীলরঙা পুলিশ চিৎকার করে ওঠে-'এই রিকশা দাঁড়া। ভাই আপনার ঘটনা কী? আপনি ঘোরাঘুরি করতেছেন ক্যান?'

নাসির আলী বলে, 'দাঁতের ব্যথার ওষুধ খুঁজছি। সামনে কি ওষুধের দোকান আছে?'

পুলিশ বলে, 'আপনের পরিচয় বলেন। নাম কী?'

'নাসির আলী।'

'করেন কী?'

'বায়িং হাউজে কাজ করি।'

'আইডি কার্ড আছে?' পুলিশ সদস্যটা শূন্যে একটা লাঠি নাচিয়ে প্রশ্ন ছোড়ে।

'জি আছে।' নাসির আলীও প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে জবাব দেয়।

'দেখি, বার করেন।'

নাসির পরিচয়পত্র বের করে। সোডিয়াম বাতির আলোয় পুলিশ সেটা ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে, তারপর বলে, 'যান ঠিক আছে। রাস্তাঘাট বেশি ভালো না। তাড়াতাড়ি ঘরে যান।'

সেখান থেকে রিকশা নিয়ে ঘুরে সে নিজেই এবার পুলিশের কাছে আসে। সে বলে, 'ভাই, আপনারা এখানে কী করছেন?'

পুলিশ বলে, 'আপনি কী করতেছেন?'

'দাঁতের ব্যথার ওষুধ খুঁজছি। সামনে কি ওষুধের দোকান আছে?'

'আপনের পরিচয় বলেন। নাম কী?'

'হামিদ আলী।'

'করেন কী?'

'কম্পিউটার ইন্‌জিনিয়ার।'

'আইডি কার্ড আছে?'

'জি আছে।'

'দেখি, বার করেন।'

নাসির পরিচয়পত্র বের করে। সেটা ভালোভাবে পরখ করে পুলিশ বলে, 'যান ঠিক আছে। রাস্তাঘাট বেশি ভালো না। তাড়াতাড়ি ঘরে যান।'

নাসির বলে, 'রিকশাওয়ালা ভাই, বললাম না, রাস্তাঘাট বেশি ভালো না? পুলিশ রাস্তায় থাকা মানেই রাস্তাঘাটের অবস্থা খারাপ, চলেন যাই গা।'

রিকশাওয়ালা রিকশা চালায়।

তখন নাসিরের নিজেরই রিকশা চালানোর পুরোনো শখটা নতুন করে উস্কে ওঠে। সে বলে, 'রিকশাওয়ালা ভাই, আপনে ওঠেন রিকশার পেছনে, প্যাসেঞ্জার সিটে বসেন। আমি চালাই।'

'না স্যার, পারবেন না।' রিকশাওয়ালা মাথা নাড়ে।

'কী বলে পারব না? বহুত চালাইছি।' নাসির আলী জোরের সঙ্গে বলে।

রিকশওয়ালাও ভীষণ শক্ত, বলে, 'কইলাম তো, পারবেন না।'

'আরে পারব।'

'আরে পারতেন না।'

'সরো মিয়া। ওঠো পিছনে। দ্যাখো পারি কি না।'

সে জোর করেই রিকশাওয়ালাকে যাত্রী-আসনে বসিয়ে রিকশা চালাতে থাকে। এই রিকশাটা ভালো। এটা একদিকে টানছে না। সে মনের আনন্দে চালায়।

রিকশাওয়ালা গান ধরে:

'বাড়ির কাছে আরশিনগর
সেথা পড়শি বসত করে একঘর পড়শি বসত করে
আমি একদিনও না দেখিলাম তারে..।

পড়শি যদি আমার হতো
যম-যাতনা সবই যেত ...।'

'ভাই, আপনার গানের গলা তো অতি চমৎকার! আপনি গান শিখেছেন কোথায়? শিল্পকলা একাডেমিতে?'

'কী কন ভাইজান?' রিকশাওয়ালা বুঝতে পারে না।

'আপনের বাড়ি কই?' নাসির আলী এবার সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে।

রিকশাওয়ালা নাসিরের পিঠে হাত রেখে বলে, 'বাড়ি সাঁইজির দেশে। কুষ্টিয়া।'

'ও তাই তো।' নাসির আলী মাথা ঝাঁকায়।

'জে তাই তো। সাঁইজির গান আমাদের সবারই জানা।'

'কিন্তু ভাই, আপনার গলায় তো কুষ্টিয়ার টান নাই। আপনার গলায় তো কুমিল্লার টান।'

'ঢাকায় আইসা রিশকা চালাইলে সব টান এক টান হয়ে যায়।'

'রাইট।' নাসির আলী রিকশা চালাতে চালাতে ঘাড় ঘুরিয়ে জবাব দেয়।

নাসির রিকশা নিয়ে আবার গ্রিন রোড ও পান্থপথের সংযোগস্থলে পুলিশ চেকপোস্টের কাছে আসে।

পুলিশ বলে, 'এই রিকশা, দাঁড়াও। ভাই আপনার ঘটনা কী? আপনি ঘোরাঘুরি করতেছেন ক্যান?'

রিকশাওয়ালা বলে, 'দাঁতের ব্যথার ওষুধ খুঁজতেছি। সামনে কি ওষুধের দোকান আছে?'

পুলিশ বলে, 'আপনের পরিচয় বলেন? নাম কী?'

রিকশাওয়ালা বলে, 'হামিদ আলী।'

'করেন কী?'

'কবিতা লেখি।'

'আইডি কার্ড আছে?'

'জে আছে।'

'দেখি, বার করেন।'

রিকশাওয়ালা আইডি কার্ড বের করে। পুলিশ চেক করে, পদের নাম–সিনিয়র এসিস্ট্যান্ট পোয়েট। 'যান ঠিক আছে। রাস্তাঘাট বেশি ভালো না। তাড়াতাড়ি ঘরে যান।' পুলিশ বলে।

রিকশাওয়ালা খুবই মজা পেয়েছে। সে বলে, 'স্যার, সাঁইজির গানের মতো গান হয় না। ওই কথা কয়টার গোমর আমারে একটু বুঝায়ে কন দেখি। আপনে তো শিক্ষিত মানুষ। আপনে পারবেন?'

'কোন কথা বলেন তো ভাই?' নাসির আলী রিকশার ঘণ্টি বাজিয়ে শুধায়।

রিকশাওয়ালা গায়, "*কী কব সেই পড়শির কথা*

ও তার হস্ত-পদ-স্কন্ধ-মাথা নাই রে।

ও সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর

আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে।" শুনছেন কথাটা? এখন কন দিকিনি এইটের কী মাইনে! হস্ত-পদ-স্কন্ধ-মাথা যদি না থাকপে, সে পড়শি হলো ক্যামনে? আর যদি এইসব নাই থাকপে, সে কেমনে একবার শূন্যে থাকে, আরেকবার পানির উপরে ভাসে?'

নাসির আলী অপারগতা প্রকাশ করে অকপটে, 'ভাই, এইসব ভাবের কথা, মারফতি লাইনের কথা, আমি জানব কী করে? আমার তো আপনার জেলায় জন্ম না।'

নাসির আলী হাপসে যায়। কত আর রিকশা চালানো চলে। এবার সে বলে, 'ভাই, আমি বিদায় নেই।'

রিকশাওয়ালা বলে, 'ভাই, আপনাকে কত ভাড়া দিতে হবে?

'আমার ভাড়া বিশ, আপনার তিরিশ, আর আপনার জমা বিশ, আপনি পাবেন পঞ্চাশ, আমি পাব বিশ। দেন বিশ দেন। এই নেন পঞ্চাশ। খুশি। পারে লয়ে যাও আমায়। আমি অপার হয়ে বসে আছি..!'

রিকশাওয়ালা হাসিমুখে বলে, 'আপনে একটা পাগল।'

'জি। আমিও কিন্তু আপনার পড়শি। আমারও কিন্তু হাত-পা-স্কন্ধ-মাথা নাই।'

রিকশাওয়ালা ততক্ষণে সিটে উঠে মেরে পায়ে প্যাডেল মারছে।

নাসির আলী ঘুরে তাকিয়ে দেখে রিকশা বেশ দূরে সরে গেছে আর তার হঠাৎ নিজেকে মনে হচ্ছে শূন্য।



রিকশাওয়ালার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একা একা হাঁটছে নাসির। কুয়াশামাখা পথ, পরাগরেণুর মতো সোডিয়াম আলো। শরীর রিকশা চালিয়ে ক্লান্ত। নাসির পা টেনে টেনে হাঁটে। পান্থপথের মাথায় এসে তাকে ষড়রিপুর মতো করে ঘিরে ধরে তিনজন ছিনতাইকারী।

তিনজন তিনটা ছোরা বের করে। চাঁদ নাকি বিজ্ঞাপনবাতির ঝকমকি আলোয় ছোরাগুলোর শানিত পাত ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

ছিনতাইকারীদের একজন বলে, 'এই, কোনো কথা না, যা আছে বার কর ঝটপট।' লোকটার একটা দাঁত লোহার নাকি রুপার, হঠাৎ তা থেকে প্রতিফলিত হয় আলো।

নাসির নির্বিকার ভঙ্গিতে বলে, 'কিছু নাই।'

'কিছু নাই? হালায় প্যাটের মধ্যে ছুরি হান্দায়া দিলে.. হালা টাকা লইয়া গিয়া গোয়ায় ভরবি?' লোকটা এত খিস্তি জানে!

'২০ টাকা আছে। রিকশা চালায়া আয় করছি।' নাসির আলী তবুও নির্বিকার।

এই ধাতব-দাঁত লোকটাই কি এদের নেতা! সে একদলা থুতু পথে ফেলে বলে, 'কয় কী হালায়? জুতাজামা পইরা রিকশা চালায়! এ, হালারে ন্যাংটা কর তো!'

দুইজন তাকে ধরে, একজন পেটে ছুরি ধরে রাখে, চাঁদের একটা ফালির মতো এই ছুরির ফলা, তারা তার জুতা খোলে, প্যান্ট খোলে, জ্যাকেট খোলে, শার্ট খোলে। পকেট তল্লাশি করে। দেহ তল্লাশি করে। নাসিরের মুখমণ্ডল থেকে একটা অবজ্ঞার হাসি ঝরে পড়ে চাঁদের আলোর সঙ্গে মিশে যায়, আরে অধর্মা রে, কিছুই তো পাবি না, ২০ টা টাকা ছাড়া।

'শালা সমুন্দির পুত। ব্যাগে থুইছে ২০ টাকা।' এক ছিনতাইকারী আরেকজনের হাতে ব্যাগটা দিয়ে দেয়।

নাসির বলে, 'ওটা নেবেন না, ওর মধ্যে আমার খুব দরকারি কাগজ আছে।'

ছিনতাইকারদের একজন বলে, 'কী কাগজ?'

নাসির কাতর কণ্ঠে বলে, 'আইডি কার্ড।'

ছিনতাইকারী বলে, 'যাব্ বে, ফোট্!'

নাসির মিনতি করে বলে, 'প্লিজ ওটা দেন।'

'আরে হউরের পুত, তোর মায়েরে বাপ, মইরা গেলে আইডি কার্ড দিয়া হাউয়া মারাইবি?'

'হ মারামুই তো। আইডি কার্ড ছাড়া চলা যায়? রাস্তাঘাটে চলতে-ফিরতে তোমার একটা আইডেন্টিটি লাগব না? দ্যাও আমার আইডি কার্ড।' নাসিরও খিস্তি শুরু করে, যেমন কুকুর, তেমনই তো হওয়া উচিত মুগুর।

ছিনতাইকারীর সঙ্গে সে বচসায় লিপ্ত হয়। সে বলে, 'এই হারামজাদা, দিলি আমার আইডি কার্ড?'

ওরা বলে, 'হউরের পুত, গেলি!'

'আইডি কার্ড না দিলে যামু না'—সেও গোয়ার্তুমি করে, তার ঘাড় শক্ত হয়ে ওঠে।

'দিমু না।' ছিনতাইকারীরাও তাদের প্রতিজ্ঞায় অটল।

'না দিলে তোগো যদি আমি যদি চামড়া না ছিলছি!' একটা ষাঁড়ের শক্তি এসে ভর করে নাসিরের শরীরে, হাতের পেশি, গলায়।

সে গিয়ে মানিব্যাগ-অপহারী লোকটার গায়ে আছড়ে পড়ে। প্রথমে ব্যাপারটা ধাক্কাধাক্কিতে, শেষে পাছড়াপাছড়িতে রূপান্তরিত হয়। ছিনতাইকারীদের একজন তার পেটে ছুরি মারলে সে রাস্তার ধারে পড়ে যায়। তখন ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুতে থাকে, অনেকটা বদনার নল দিয়ে যে রকম করে পানি বেরয়, তেমনিভাবে, লাল নয়, খয়েরি ধরনের রং সেই রক্তের। রক্তের বিছানায় সে শুয়ে পড়ে।

রক্তের উষ্ণতায় সে আরাম পায়।

আর আরামের সঙ্গেই সে বেশ শান্তভাবে মরে যায়।



সকালবেলা। নাসির রোজকার মতো ঘুম থেকে উঠেছে অফিসে যাবে বলে। কয়েকদিন আকাশটা ঘন কুয়াশার চাদরমুড়ি দিয়ে থাকবার পরে আজই সূর্য উঠেছে। জানালা দিয়ে একটা উজ্জ্বল আলোর চারকোণা টুকরা এসে বিছানায় পড়েছে, মনে হচ্ছে, নীল এনভেলাপে একটা উজ্জ্বল ডাকটিকেট। ফলে ঘুম ভেঙেছে আলোর করাঘাতে। মর্নিং শোজ দ্য ডে। আজ দিনটা ভালোই যাবে। নাসির আলীরও মনটা বেশ রোদ-মচমচে।

আজকাল আর সে ধানমণ্ডি লেকের ধারে যায় না প্রাতঃভ্রমণের উদ্দেশে। একটা মেশিন কিনে নিয়েছে। হাঁটার কাজটা সে বাসাতেই সারে। সেটাও সারা হয়ে গেছে। আজকে সে অনেকক্ষণ ব্যায়াম করেছে বলে এখনও তার গরম লাগছে। গা ভর্তি ঘাম। গোসল না করলে স্বস্তি লাগবে না। তবে চায়ের কাপ হাতে পত্রিকা পড়তে গিয়ে সে গোসলের কথা ভুলে যায়।

সে পত্রিকা মেলে ধরলে একটা খবরে তার চোখ যায় আটকে।

খবরটা হল, পান্থপথের মাথায় অজ্ঞাতনামা যুবকের লাশ উদ্ধার।

খবরের ওপরে তিন কলাম জুড়ে লাশটার রঙিন ছবি। সে দেখতে পায় হুবহু তারই একটা নগ্নদেহের ছবি ছাপা হয়েছে। চেহারাটা অবিকল তার। নিজের রঙিন মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করে সে থমকে যায়। ভাগ্যিস, লাশটাকে অজ্ঞাতনামা বলা হয়েছে। ভাগ্যিস, আততায়ীরা কাল আইডি কার্ডটা কেড়ে নিতে পারে নাই। না হলে তো তার আইডেন্টিটি ছাপা হয়ে যেত পত্রিকায়। তাহলে কে মারা গেল। নাসির আলী, নাকি হামিদ আলী। হামিদ আলী ঘুমাচ্ছিল, নাসির আলী উঠে বাইরে গেছে। আর এই বাইরে যাওয়াটাই কাল হয়েছে তার জন্যে।

আজকালকার জমানায় কেউ রাতের বেলা একা একা বাইরে যায়? রিকশায় ঘোরে?

তাহলে নাসির আলী আর বেঁচে নাই। বেঁচে আছে হামিদ আলী।

হামিদ আলী! হামিদ আলীর চেহারাটা কেমন? সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গালে শেভিং ক্রিম লাগাতে লাগাতে ভালো করে লক্ষ করে।

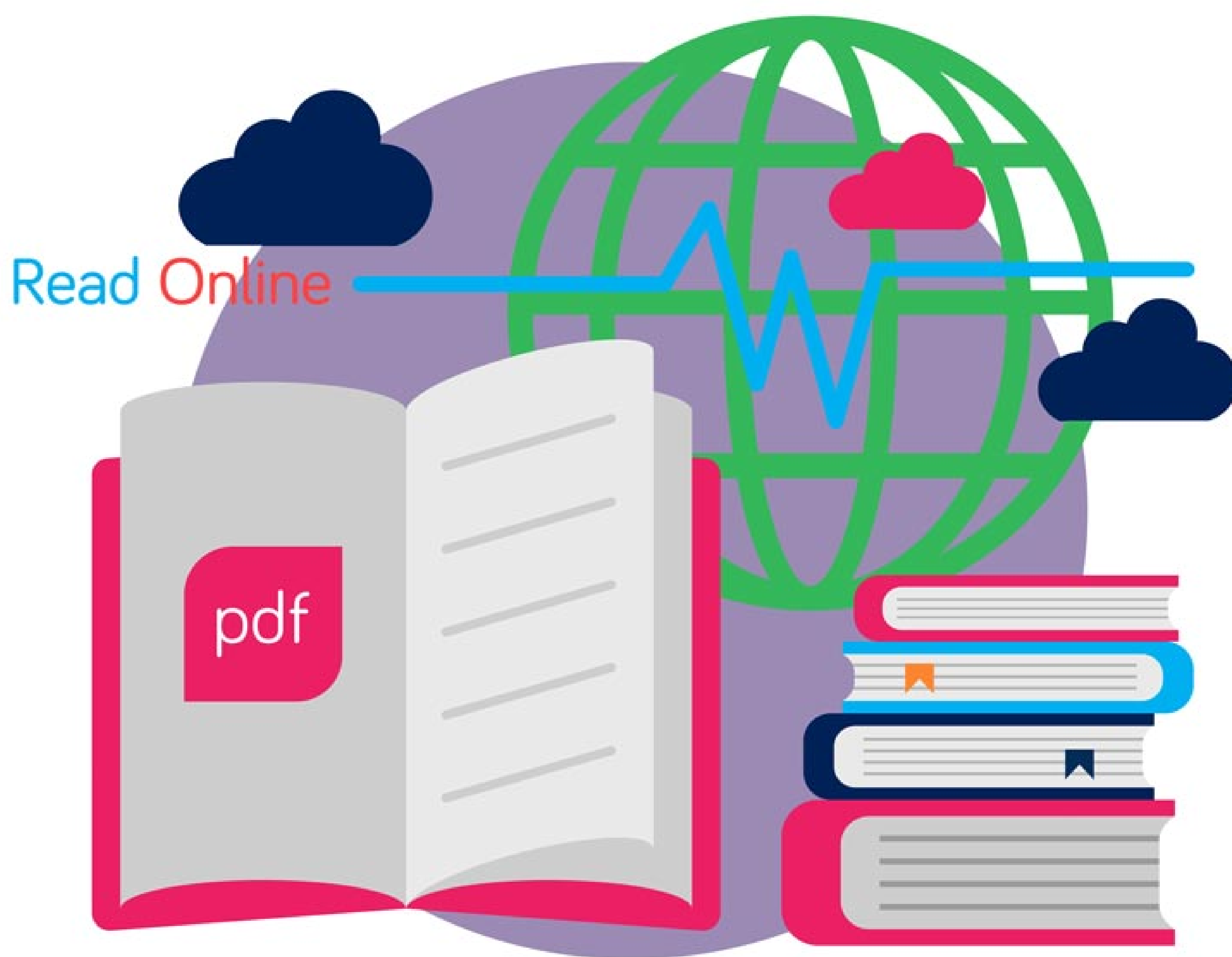
হামিদ আলীর চেহারা নাসির আলীর মতো। ফলে, চালিয়ে নেওয়া যাবে। সংসারে কিংবা অফিসে, বাসে কিংবা ফুটপাথে কাজকর্ম চলাফেরায় তার কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। নাসির আলীর জন্যে তার ভীষণ মায়া হয়! আহা বেচারা, এইভাবে অপঘাতে মারা গেল! কী করছে এখন সে! লাশকাটা ঘরে শুয়ে আছে! একটা মানুষের লাশ! মানুষের! শুধু লাশ বললে হয় না। আবার মানুষের লাশ বলতে হবে।

একটা লাশের ছবি দেখে দিনটা শুরু হলো, কে জানে তার সারাটা দিন কেমন যাবে–এই রকম একটা সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তায় আক্রান্ত হয় সে।

'নাসির, নাসির।' রেবা ডাকছে।

'আসছি।' সে সাড়া দেয়। তারপর আয়নায় ফুটে ওঠা প্রতিবিম্বটার দিকে তাকিয়ে একটা মুচকি হাসি দেয়। রেবা কাকে ডাকছে, আর কে জবাব দিচ্ছে!

প্রতিবিম্বটাও তাকে সেই হাসি ফিরিয়ে দেয়।


Read Online
pdf